পৃথিবীর ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ম্যাকমিলান এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a textbook for Class VIII
Vide Notification No.Syl./68/55, dated 18. 10. 55.

পৃথিবীর ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম.এ., পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম.এ.
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক, রাণী ভবানী স্কুল, কলিকাতা

প্রণীত

ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড
২৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৬৭

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED
LONDON BOMBAY CALCUTTA MADRAS MELBOURNE

THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED
TORONTO

ST MARTIN'S PRESS INC
NEW YORK

First Edition 1955
Reprinted 1959, 1960, 1961, 1962
Revised 1963
Reprinted 1964 (*thrice*), 1966, 1967

MADE IN INDIA
PRINTED BY T. P. BANERJEE AT UNIQUE PRINTERS
38, SURYA SEN STREET, CALCUTTA-9

সূচী

*মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী পুনর্লিখিত
(সার্কুলার নং ২৭৬৩২/জি তাং ২১শে অক্টোবর, ১৯৬৩)

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপের "নবজন্ম" ও ধর্মসংস্কারের যুগ

মধ্যযুগের জীবনযাত্রা—ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই যে, তখনকার লোকের জীবনের উপর রোমান ক্যাথলিক চার্চের অসীম প্রভাব ছিল। এই চার্চের উপর প্রভুত্ব করতেন খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ। তাঁর আদেশ কেউই লঙ্ঘন করতে পারত না, এমন কি রাজারাও নয়। শিক্ষিত লোকেরা বেশীর ভাগই ছিলেন ধর্মযাজক; লেখাপড়ার ভারও ছিল তাঁদের উপরে। তাই খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। মধ্যযুগের এইসব যাজক সাধারণ লোকেদের, কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে, অন্ধভাবে চার্চকে মান্য করতে শেখাতেন; তাছাড়া সংসারের সকল রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তাদের পরলোকের চিন্তা করতে বলতেন। এই জন্য সমাজে পরলোকের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল; জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগের ইচ্ছাকে পাপ বলে মনে করা হত। কেউ যদি চার্চের বিরুদ্ধ মত পোষণ করত তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হত। এই ভাবে ধর্মের প্রচণ্ড শাসন ও চিরাচরিত প্রথার চাপে লোকে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। কোন কিছুর বিরুদ্ধে কোন রকম প্রশ্ন না তুলে তারা নির্বিবাদে পিতৃপিতামহদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করত।

"নবজন্মের যুগ"—কিন্তু এই অন্ধ সংস্কারের যুগেরও একদিন সমাপ্তি ঘটল। তখন ইউরোপের ইতিহাসে আর এক নূতন যুগের সূচনা হয়। এ যুগের মানুষেরা অতীতের সংস্কার ও বাধাবন্ধন মানতে চাইল না।

তারা আবিষ্কার করল নূতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা। তাই ঐতিহাসিকেরা এই যুগের নাম দিয়েছেন 'রেনেসাঁস' (Renaissance) বা 'নবজন্মের যুগ'।

এই সময়ে ইটালি প্রভৃতি দেশে একদল পণ্ডিত প্রাচীন গ্রাক ও রোমানদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নূতন ভাবে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, প্রায় হাজার বছর আগে এই প্রাচীন সভ্য জাতি দুটি কেবল মাত্র ধর্মতত্ত্বই আলোচনা করত না, মানবজীবনের প্রয়োজনীয় আরও বহু তত্ত্বের তারা চর্চা করত। সেকালের দর্শন পড়ে তাঁরা জানলেন যে তখনকার পণ্ডিতেরা বিনা বিচারে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না; সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতেন। স্বাভাবিক ভাবে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগকেও তাঁরা পাপ বলে মনে করতেন না। কাজেই পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতগণ এসব থেকে স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা লাভ করলেন। জীবনের বহু বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল, এবং অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারগুলো উচ্ছেদ করবার জন্য তাঁরা সাহস সংগ্রহ করলেন। আর তাঁরা পরলোকের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে চাইলেন না। স্বাভাবিক, সুস্থ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য তাঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এইভাবে এক নূতন যুগের শুরু হয়।

মধ্য ও বর্তমান যুগের সন্ধিক্ষণ—রেনেসাঁসের যুগে মধ্যযুগের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার ক্রমশঃ পরিবর্তন হচ্ছিল। সেইজন্য ঐতিহাসিকেরা এই যুগকে বর্তমান ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণ বলে নির্দেশ করেন। সাধারণতঃ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের সময় থেকে রেনেসাঁসের যুগ আরম্ভ হয়েছিল বলা হয়। কারণ, কনস্টান্টিনোপ্‌ল থেকে বহু গ্রীক পণ্ডিত তখন তাঁদের অমূল্য পুঁথিপত্রগুলি নিয়ে

পশ্চিম ইউরোপে আসেন এবং সেখানে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের চর্চা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

সারা ইউরোপ জুড়ে নবজীবনের এই বিশাল আলোড়ন একদিনেই সম্ভব হয়নি—এর জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছিল। শীত শেষ হয়ে কখন যে পৃথিবীতে বসন্ত এসে যায় তা যেমন কেউ বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি করেই কখন যে মধ্যযুগ শেষ হয়ে রেনেসাঁসের যুগ শুরু হয়েছিল তারও কোন নির্দিষ্ট সীমা কেউ বলে দিতে পারেন না। তবে মধ্যযুগের শেষের দিকেই যে পশ্চিম ইউরোপবাসীদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে ইউরোপে একদল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়, তাঁদের বলা হয় 'স্কুলমেন'। তাঁরা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন তুলতেন এবং নিজেরাই যুক্তি দিয়ে তার সমাধান করতেন। মধ্যযুগে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে ধর্মতত্ত্বই প্রধান স্থান পেত, চার্চের মতবিরোধী কোন শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হত না। তা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন, তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নূতন আলো এসে পড়ত, এবং তার ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার খানিকটা কেটে যেত। এইভাবে স্বাধীন চিন্তার খানিকটা প্রসার হয় এবং রেনেসাঁসের পথ উন্মুক্ত হয়।

ইটালীতে রেনেসাঁসের আলোড়ন—রেনেসাঁসের প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ইটালীতে। এই সময়ে ইটালীর কোন রাজনৈতিক একতা ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের মত সেখানে কতকগুলি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এরা খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সব শহরের লোকেরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিল। তাদের উৎসাহে

ইটালীতে বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং সেখানে প্রাচীন যুগের বহু অমূল্য পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়। তখন মাটি খুঁড়ে রোমান আমলের প্রাসাদ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সুন্দর সুন্দর মূর্তি ইত্যাদিও আবিষ্কার করা হয়েছিল। এই সব কারণে ইটালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, মিলান প্রভৃতি শহরে রেনেসাঁসের প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছিল।

পেত্রার্ক ও বোকাশিও—ইউরোপে যাঁরা রেনেসাঁসের প্রবর্তন করেন তাঁদের বলা হয় 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবতাবাদী; কারণ, মধ্য যুগের পণ্ডিতদের মত তাঁরা শুধু ধর্মচর্চাই করতেন না, তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের চর্চাও করতেন, তা ছাড়া মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁরা চিন্তা করতেন। এইরকম একজন মানবতাবাদী ছিলেন পেত্রার্ক।

পেত্রার্ক ইটালীতে রেনেসাঁসের বার্তা সর্বপ্রথম বহন করে এনেছিলেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের বহু ধর্মমন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন পুঁথিপত্র নকল করে সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি তিনি গভীর যত্নের সঙ্গে পাঠ করেন এবং দেশবাসীদের কাছে তার ভাব ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে তিনি ইটালীয়দের মনে গ্রীক ও রোমানদের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। লাটিন ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

পেত্রার্কের সঙ্গে সঙ্গেই নাম করতে হয় তাঁর স্বদেশবাসী ও বন্ধু বোকাশিওর। তাঁর রচিত ইটালীয় গল্পগুচ্ছ 'ডেকামেরন' শেক্সপীয়ারের মত কবিকেও একদিন প্রেরণা দিয়েছিল। পেত্রার্কের মত বোকাশিও-ও দেশবাসীদের কাছে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের গৌরব প্রচার করেন। তাছাড়া এই দুজন লেখকই তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন।

ম্যাকিয়াভেলি—এ যুগের আরেকজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন ফ্লোরেন্সের রাজনীতিবিদ্ ম্যাকিয়াভেলি। আমাদের দেশের কৌটিল্যের লেখা 'অর্থশাস্ত্রের' মত একখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বইখানির নাম 'দি প্রিন্স'। এই বইখানিতে খণ্ড এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইটালীতে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। সে চেষ্টা সফল হয়নি, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের অন্যতম জন্মদাতারূপে ম্যাকিয়াভেলির নাম অমর হয়ে রয়েছে।



রাফাএল অঙ্কিত ম্যাডোনা
(মাতা মেরীর কোলে যীশু)



মাইকেল এঞ্জেলো নির্মিত
মোজেজের মর্মর মূর্তি

ইটালীতে রেনেসাঁসের চরম বিকাশ আমরা দেখতে পাই এখানকার চিত্রাঙ্কনবিদ্যায়, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে। এই সকল ক্ষেত্রে যে সব শিল্পী তখন খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে **রাফাএল, মাইকেল এঞ্জেলো** ও **লিওনার্দো দা ভিঞ্চির** নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাফাএলকে তাঁর সমসাময়িক পোপ ও রাজারা সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে সম্মান দেখাতেন। তাঁর অঙ্কিত ম্যাডোনা অর্থাৎ মাতা মেরীর কোলে যীশুর চিত্রগুলি চিত্রজগতের অমূল্য সম্পদ। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন একাধারে কবি, চিত্রকর, স্থপতি ও ভাস্কর। পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ করতে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী এখনও বিরল। মাইকেল এঞ্জেলো পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মর্মর মূর্তি নির্মাণ করে গেছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্রও তিনি এঁকেছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে সবচাইতে প্রতিভাশালী ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্রকলাতে যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি দর্শন, গণিত, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও সুপণ্ডিত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আকাশে ভ্রমণ করবার জন্য একটি এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করেন। তখনকার বহু লোক তাঁকে যাদুকর বলে ভাবত। তবে চিত্রকর হিসাবেই তাঁর সবচেয়ে বেশী নাম। 'মোনা লিসা' তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র। ইটালীর এই তিনজন শিল্পীই রোম এবং ফ্লোরেন্সের বহু গীর্জা ও প্রাসাদে নিজেদের তুলির রেখা অমর করে রেখে গেছেন।



লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত
মোনা লিসা

রোমের সেণ্ট পীটার্স গীর্জা এই যুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করে এই বিখ্যাত গীর্জাটি তৈরী করা হয়েছিল। মাইকেল এঞ্জেলো এর উপরকার বৃহৎ গম্বুজটি নির্মাণ করেছিলেন। মিলানের প্রধান গীর্জাও সেকালের স্থাপত্য শিল্পের আর একটি অমর কীর্তি।



সেণ্ট পিটার্স গীর্জা

আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার আরম্ভ—মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চাকে গোঁড়া ধর্মযাজক সম্প্রদায় বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে চারুশিল্প ও সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনাও পুরোনো ধারাকে ছাড়িয়ে এক নূতন স্তরে এসে পৌঁছেছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর। প্রাচীন আমল থেকেই লোকেরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী হল সমগ্র সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল;

সূর্য, গ্রহনক্ষত্র সব কিছুই তাকে ঘিরে ঘুরছে। পোল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস প্রথম আবিষ্কার করলেন যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল নয়, সে নিজেই সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। কিন্তু চার্চের হাতে শাস্তির ভয়ে তিনি একথা প্রকাশ করতে সাহস করেন নি। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর পর এই মহাসত্যটিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। দূরের জিনিসকে বড় করে দেখবার জন্য 'দূরবীক্ষণ' নামে একরকম যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। এরই সাহায্যে প্রথম তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু এই নূতন মতবাদকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করলেন। গ্যালিলিওকে 'ধর্মদ্বেষী' বলে অভিযুক্ত করা হল। তাঁর মত ভুল—এই কথা স্বীকার করে তবে তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তখনও মানুষের মন অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি।



সেক্সপীয়ার

ইটালীর বাইরে রেনেসাঁস আন্দোলন—রেনেসাঁস আন্দোলন ইটালী থেকে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায়। এর ফলেই ইংল্যাণ্ডে সৃষ্টি হয় **সেক্সপীয়ারের** মহান্ সাহিত্য। তাঁর রচিত ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লীয়ার প্রভৃতি নাটকগুলি আজও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। এ যুগের ইংল্যাণ্ডের আর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন **বেকন**। ইংরাজী দর্শনের তিনি

আদিগুরু। ইংরাজী প্রবন্ধ-সাহিত্যও তাঁর হাতে এক নূতন রূপ পেয়েছিল। ওলন্দাজদের মধ্যেও এই সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও শিল্পীদের আবির্ভাব হয়। শিল্পী **রেমব্র্যাণ্ট** ওলন্দাজ চিত্রকরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার—রেনেসাঁসের যুগের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। জার্মানীর গুটেনবার্গ নামে এক ভদ্রলোক এর আবিষ্কার করেছিলেন। মধ্যযুগে বিদ্যালোচনার সুযোগ ছিল অতি সামান্য। তখন হাতে লিখে বই নকল করতে হত এবং সেগুলি ছিল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে সে সব বই যোগাড় করে পড়া সম্ভব হত না। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিশ্রমে, কম খরচে এবং কম সময়ে বহু বই ছাপা হতে লাগল। ফলে দেশের লোকেরা জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এইভাবেই মানবতাবাদীদের আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এত বড় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

ধর্মসংস্কার-আন্দোলন—রেনেসাঁসের ফলে ইটালীর লোকেরা বিদ্যাচর্চা, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিতে অনুরাগী হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য আলোচনা করে তারা পুরোনো যুগের মতই সহজ জীবন যাপন করবার পক্ষপাতী হয়ে পড়ে; তাদের মন কঠোর ধর্মজীবন ত্যাগ করে পার্থিব ভোগ-সুখের দিকে যায়। কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে রেনেসাঁসের ফল হল অন্যরূপ। হিব্রু ও গ্রীক ভাষার চর্চার ফলে তারা বাইবেলের যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং রোমান ক্যাথলিকদের দুর্নীতিগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন তারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের রীতিনীতির বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করে। ফলে সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে 'ধর্মসংস্কার' নামে এক বিশাল আন্দোলনের সৃষ্টি হল।

এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে তখনকার রোমান ক্যাথলিক চার্চের অধঃপতন। স্বয়ং পোপ থেকে শুরু করে সাধারণ ধর্মযাজক পর্যন্ত সকলেই ধর্মশিক্ষাদান অপেক্ষা অর্থসংগ্রহকেই বড় বলে মনে করতেন, এবং সাধুভাবে জীবন যাপনের পরিবর্তে বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতেন। তাঁদের জীবনে ধর্মনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিচয় না পেয়ে সাধারণ লোক তাঁদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের ব্যয়ভার মেটাবার জন্য তাঁরা অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর নানারকম কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। পোপ নিজেই প্রচার করেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, কাজেই কোন পাপী যদি তার পাপকার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পোপের ভাণ্ডারে অর্থ দান করে তবে তিনি তার সব পাপ মোচন করে স্বর্গে যাবার জন্য একটি মুক্তিপত্র দান করবেন।

মার্টিন লুথার—এই সব মিথ্যা সংস্কারের জাল মধ্যযুগের অশিক্ষিত জনসাধারণকে অভিভূত করলেও রেনেসাঁসের যুগের নবীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাতে ধরা দিলেন না। মার্টিন লুথার বলে একজন জার্মান দেশীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। এই সময়ে সেণ্ট পীটার্স গীর্জাটির নির্মাণকার্য শেষ করবার জন্য পোপ মুক্তিপত্র বিক্রয় করবার কথা ঘোষণা করেন। মার্টিন লুথার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি সকলকে বললেন যে, অনুতাপই হচ্ছে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, অর্থব্যয় করে পাপমোচন করা যায় না। তিনি আরও বললেন যে, ধর্মবিষয়ে

সবাই স্বাধীন। বাইবেল পড়লেই ধর্মের মূল কথা জানা যায়। তার জন্য পোপের অধীনতা স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। জার্মানীতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হল। এর আগেই ইরাস্‌মাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ধর্মসম্বন্ধে যাজকদের মূর্খতা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাতে লোকের অন্ধভক্তির মূল কতকটা শিথিল হয়ে এসেছিল। এবার লুথারের যুক্তি ও বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই তাঁর প্রচারিত নূতন মতবাদ গ্রহণ করলেন। পোপ দশম লিও এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লস অনেক চেষ্টা করেও এই মতবাদকে দমন করতে পারলেন না। জার্মানীর কয়েকজন রাজাও লুথারের পক্ষ সমর্থন করলেন। এর ফলে মধ্যযুগের অখণ্ড খ্রীষ্টান জগৎ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রাচীনপন্থীরা রয়ে গেলেন রোমান ক্যাথলিক, আর নবীনপন্থীরা **প্রোটেষ্ট্যাণ্ট** বলে পরিচিত হলেন।



মার্টিন লুথার

ক্যালভিন—জার্মানী থেকে এই ধর্মসংস্কারের আন্দোলন ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ক্যালভিন ও জুইংল নামে দুজন পণ্ডিত পোপের বিরুদ্ধে মাথা তুলে-ছিলেন। এঁদের মতবাদ লুথারের থেকে কোন কোন বিষয়ে পৃথক ছিল। ক্যালভিন ছিলেন জাতিতে ফরাসী, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা। তিনি দীর্ঘকাল এই শহরের প্রকৃত শাসক ছিলেন; নগরবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে

সঙ্গে তাদের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনাও তিনি নিজেই করতেন। তাঁর মতে মানুষকে পবিত্র জীবন যাপন করতে সুযোগ দেওয়া শাসকের একটি বড় কর্তব্য। সুতরাং মানুষের ধর্মজীবন থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জেনেভায় ক্যালভিনের স্থাপিত নূতন ধরনের রাষ্ট্রকে 'ঈশ্বরের নগর' (City of God) বলা হয়েছে, কারণ তাঁর মতাবলম্বীদের বিশ্বাস ছিল যে, এখানে মানুষ ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করে। ক্যালভিন নিজেকে বলতেন 'জেনেভার সেবক'। তিনি জীবনে কঠোর সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য ইংল্যাণ্ডে তাঁর মত যারা মেনে নিয়েছিল তাদের পবিত্রতাবাদী বা 'পিউরিট্যান' বলা হত। প্রধানতঃ সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডে ক্যালভিনের মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলন—এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরী। প্রথমে তিনি পোপের খুব অনুগত ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করে অ্যান বোলেন নামে আর একজন মহিলাকে বিবাহ করবার জন্য পোপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ক্যাথারিন ছিলেন স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের মাসী আর চার্লস নিজে ছিলেন ধর্মব্যাপারে পোপের প্রধান সহায়। কাজেই পোপ সহসা এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করে উঠতে পারলেন না। অসহিষ্ণু হেনরী প্রকাশ্য ভাবেই পোপের বিরোধিতা করে অ্যানকে বিবাহ করলেন।

এর পরে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। এই পার্লামেণ্ট ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে 'রিফর্মেশন পার্লামেণ্ট' বলে বিখ্যাত। এর সদস্যরা ইংল্যাণ্ডে পোপের সমস্ত ক্ষমতা

ও অধিকার বিলুপ্ত করে দিলেন। পোপের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডের চার্চের প্রধান হলেন রাজা স্বয়ং। হেনরীর আদেশে বাইবেল ইংরাজীতে অনুবাদ করা হল এবং প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক গীর্জাকে ইংরাজী বাইবেল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হল। নিজেদের মাতৃভাষায় বাইবেল পড়তে পেরে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সাধারণ লোকেদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এই সময়ে হেনরীর আদেশে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত 'মনাষ্টারী' বা সন্ন্যাসীদের আশ্রমগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এক সময়ে এই 'মনাষ্টারী'গুলি ছিল নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং দরিদ্রের সহায়। সন্ন্যাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একদিন এদের দ্বারা ইংল্যাণ্ডের কৃষি ও শিল্পের, শিক্ষা ও চিন্তাধারার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীরা ক্রমেই অলস এবং স্বার্থপর হয়ে ওঠেন। সেজন্য রাজা হেনরী দুর্নীতির অপরাধে তাঁদের সমস্ত আশ্রম ধ্বংস করে ফেলবার আদেশ দিলেন এবং তাঁদের সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

বাইরে পোপের বিরোধিতা করলেও মনেপ্রাণে হেনরী রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী ছিলেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি শুধু পোপের ক্ষমতা লোপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বহু লোকের মনে তখন ধর্মসংস্কারের আগ্রহ জন্মেছিল। কাজেই নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরকম বাধ্য হয়েই হেনরীকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের আচার-অনুষ্ঠানগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়। পরে হেনরীর কন্যা রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডের ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হয়। নানারকম পরিবর্তনের পর ইংল্যাণ্ডবাসীরা রোমান

ক্যাথলিক ও ইউরোপের গোঁড়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মত এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিয়েছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে একই ধর্মের ভিত্তিতে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সকলেই একরকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। পোপের হুকুম সবদেশেই ছিল অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে 'রিফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কারের প্রভাবে সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহুকাল ধরে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ধর্মযুদ্ধ চলতে থাকে। মার্টিন লুথারের মৃত্যুর পরে জার্মানীতে এইরকম একটি গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর সমাপ্তি হয় ত্রিশ বছর পরে। স্কটল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সেও কিছুদিন ধরে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে অতটা না হলেও ধর্মের নামে বিরোধ বেশ প্রবল হয়েছিল। এই গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্য অবশেষে ইউরোপের সব দেশই পরধর্মসহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করে। রাজার যে ধর্মই থাকুক না কেন, প্রজাদের নিজেদের ইচ্ছামত ধর্মমত বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই ভাবে পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে উদার মত গ্রহণ করায় ইউরোপের গৃহযুদ্ধগুলির অবসান হয়।

ইউরোপে যখন একই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিল তখন ভারতবর্ষ ও চীনে বহু ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এক ভারতেই হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের লোকের সমাবেশ দেখা যেত। কিন্তু ইউরোপের মত ধর্মমত নিয়ে এই দুটি দেশে কোনরকম বিরাট অশান্তি দেখা দেয়নি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তখন প্রাচ্যের এসব দেশের লোকেরা ইউরোপবাসীদের চেয়ে ধর্মসম্বন্ধে অনেক বেশী উদার ছিল।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৪৫৩—রেনেসাঁসের যুগের সূচনা

১৫১৭—ধর্মসংস্কার আন্দোলন

অনুশীলনী

১। রেনেসাঁস্ বলতে আমরা কি বুঝি ? কোন্ সময় থেকে রেনেসাঁসের যুগ আরম্ভ হয়েছিল ? কোন্ দেশে এবং কেন রেনেসাঁসের সর্বপ্রথম সূচনা হয়েছিল ? রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপের ভাবধারা ও জীবনযাত্রার কি পরিবর্তন হয়েছিল ?

২। মানবতাবাদী (হিউম্যানিষ্ট) কাদের বলা হত ? কেন তাঁদের কাজ ও ভাবধারা এত বিখ্যাত ? ইটালীর কয়েকজন বড় বড় মানবতাবাদীর নাম কর। তাঁদের সম্বন্ধে কি জান ? রেনেসাঁসের যুগের কয়েকজন বড় বড় ইটালীবাসী শিল্পীর নাম কর। কেন তাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন ? এই সময়ে বিজ্ঞান-চর্চার কি রকম উন্নতি হয়েছিল ? ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁসের ফল কি ভাবে প্রকাশ পায় ? মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার মানুষের উন্নতির পথে কি ভাবে সহায়তা করে ?

৩। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্মসংস্কার বলতে কি বোঝা যায় ? কেন এই সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল ? রেনেসাঁসের যুগের পরেই কেন এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয় ? কোন্ দেশে এই ধর্মসংস্কারের আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল ? মার্টিন লুথার ও জন ক্যালভিন সম্বন্ধে কি জান ? ইংল্যাণ্ডের ধর্মসংস্কারের বর্ণনা কর। কি ভাবে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টের মধ্যে কলহের মীমাংসা হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার ও বহির্জগতে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের সূচনা

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে ভৌগোলিক আবিষ্কার—"নবজন্ম" ও ধর্মসংস্কারের যুগে ইউরোপের অধিবাসীদের মনে যে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল তা তাদের নূতন নূতন অভিযানের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। তখন পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের অনেক দেশই ছিল তাদের অজানা। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা বড় বড় সমুদ্র পার হয়ে সমস্ত পৃথিবীই আবিষ্কার করে ফেলল; আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় ইউরোপীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাদের এই দেশ আবিষ্কারের পিছনে প্রথম প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা ও অন্য দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শুধু এই কারণেই তখনকার ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি সম্ভব হয়নি। এর আরও অন্য কারণ ছিল। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার আকার যে গোল—এই মহাসত্যটি তখনকার সময়ের পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতদের মনে সর্বপ্রথম উদিত হয়। দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্রও এই সময়ে আবিষ্কৃত হওয়ায় অকূল সমুদ্রে পথ হারিয়ে যাবার ভয় আর ছিল না। এছাড়া অনেক নাবিক তখন সমুদ্রপথের মানচিত্র তৈরী করে বিষুবরেখা থেকে কোন্ স্থান কত দূরে, কোন্ দিকে অবস্থিত এই সব তথ্য সংগ্রহ করে লিখে রাখত। কাজেই সমুদ্রযাত্রা ক্রমে সব দেশের নাবিকদের কাছে সুগম হয়ে উঠেছিল।

প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় বণিকদের ঔৎসুক্য—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে **মার্কো পোলো** নামে একজন ইটালীয় বণিক বহু কষ্ট সহ্য করে চীন দেশের পিকিং শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একাদিক্রমে সতের বছর সেখানে বাস করে দেশে ফিরে যান। এর কিছু কাল পরে তাঁর একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। মার্কোর বইতে চীনের অগাধ ঐশ্বর্য, জাপানের অফুরন্ত স্বর্ণভাণ্ডার, মলক্কা ও সিংহল দ্বীপের মশলা প্রভৃতির কথা পড়ে ইউরোপের লোকেদের মনে প্রাচ্যের দেশগুলি সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল জেগে ওঠে। যে সমস্ত নাবিক পরে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করে ইউরোপবাসীদের মনে বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা অনেকে ছিলেন এই মার্কোর স্বদেশবাসী—অর্থাৎ ইটালীদেশীয়। কিন্তু নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইটালীবাসীরা বিশেষ কিছু লাভ করতে পারল না। তার কারণ স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজারা এই সব নাবিকদের টাকা পয়সা, লোকজন ও জাহাজ দিয়ে সাহায্য করতেন ; সেইজন্য তাঁরাই এই আবিষ্কারের সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করবার অধিকারী হন।

আরবদেশীয় বণিক—মধ্যযুগে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ভূমধ্য সাগর। আমরা এর আগেই বলেছি যে, ইটালীর শহরগুলি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আরব বণিকেরা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ, সিংহল দ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা এমন কি সুদূর চীন জাপান থেকেও মণিমুক্তা, রেশম বস্ত্র, নানা রকম সুগন্ধি ও সুখাদ্য মশলা সংগ্রহ করে ভূমধ্য সাগরের বন্দরগুলিতে নিয়ে আসত। উট আর ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে স্থলপথেও অনেক জিনিস সেখানে পাঠান হত। ইটালীর বণিকেরা এগুলি কিনে

নিয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে খুব চড়া দামে বিক্রী করে অনেক লাভ করত।

মশলা দ্বীপের সন্ধান—ইউরোপের বাজারে তখন মশলার চাহিদা ছিল খুব বেশী। পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা সেইজন্য বহুদিন থেকে যে সব দেশে মশলা জন্মাত সেই সব দেশে যাবার জন্য নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল। কারণ ভূমধ্য সাগরের পথ ছিল ইটালীয় বণিকদের হাতে, আর এশিয়া মাইনর ও লোহিত সাগরের পথ ছিল আরবদের দখলে। এর পরে যখন অটোম্যান তুর্কিদের রাজত্ব সমগ্র পশ্চিম এশিয়াতে বিস্তার লাভ করল, এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপ্‌ল্ তাদের হাতে পড়ল, তখন কোনো ইউরোপীয় বণিকেরই—এমন কি ইটালীর বণিকদেরও—প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার আর কোনো উপায় রইল না। অথচ মশলা না হলে খাওয়া চলে না—তাই তারা নূতন কোন পথে মশলার দেশে যাওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে।

পর্তুগাল ও স্পেনের সামুদ্রিক অভিযান—সে যুগের সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগাল ও স্পেনই ছিল অগ্রণী। পর্তুগালের **রাজপুত্র হেনরী** আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে **বার্থোলোমিউ দিয়াজ** নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এখানে তাঁকে বিপৎসঙ্কুল ঝড়-তুফানের মধ্যে পড়তে হয়েছিল বলে তিনি আফ্রিকার এই শেষ প্রান্তের নাম দেন "ঝড়ের অন্তরীপ"; কিন্তু পর্তুগালের রাজা এই নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম রাখলেন "উত্তমাশা অন্তরীপ", কেন না এতদিনে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছোনো যাবে বলে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

প্রায় দশ বছর পরে **ভাস্কো দা গামা** নামে আর একজন অসম-সাহসিক পর্তুগীজ নাবিক ছোট ছোট চারখানি জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। জাঞ্জিবারের কাছে এসে তিনি সরাসরি সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন (১৪৯৮ খৃঃ)। এইভাবে এত কালের চেষ্টার পর জলপথে ভারতবর্ষে আসবার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন থেকে পর্তুগীজেরা এদেশে কুঠি স্থাপন করে রীতিমত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দিল।



ভাস্কো দা গামা

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার—ভাস্কো দা গামার সময়ে ইটালীর জেনোয়া শহরে কলম্বাস নামে একজন নাবিক বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হলেই ভারতবর্ষে পোঁছোনো যাবে। কারণ তখন আমেরিকার অস্তিত্ব পর্যন্ত কেউ জানত না। এদেশে আসবার জন্য কলম্বাস পর্তুগালের রাজার কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সেখানে বিফলমনোরথ হয়ে তিনি স্পেনে এসে রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলার কাছে তাঁর আবেদন জানান। ইসাবেলার আদেশে তিনখানি ছোট জাহাজ ও একশ'জন সঙ্গী দিয়ে কলম্বাসকে সাহায্য করা হল। এরপর আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে একাত্তর

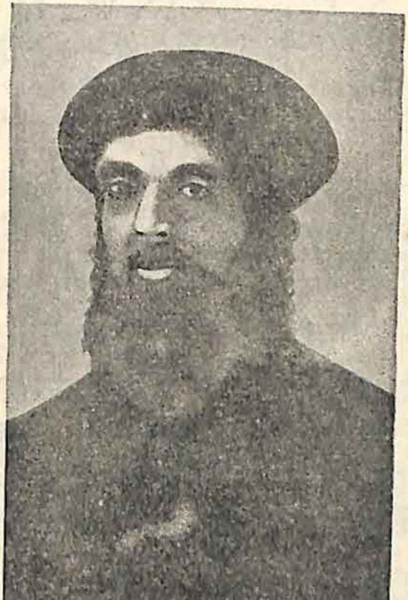
দিন পরে তিনি স্থল দেখতে পান। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর আমেরিকার বিশাল মহাদেশটির অস্তিত্ব ইউরোপবাসীদের কাছে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কলম্বাস নিজে কিন্তু তা বুঝতে পারেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতের উপকূলেই এসে পৌঁছেছেন। এইজন্য প্রথমে তিনি যে দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই দ্বীপটি ও তার আশেপাশের দ্বীপগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল "ইণ্ডিজ", আর সেখানকার অধিবাসী-দের বলা হত "ইণ্ডিয়ান"। এখনও এই দ্বীপগুলিকে "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" বলা হয়।



কলম্বাস

এরপরে আমেরিকার কাছাকাছি আরও কয়েকটি দ্বীপ কলম্বাস আবিষ্কার করলেন, কিন্তু আসল মহাদেশটির তিনি সন্ধান পেলেন না। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই আমেরিগো নামে ফ্লোরেন্সের একজন অধিবাসী স্পেনের মহানাবিকের পদ লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করে একটি বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই নাম অনুসারে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারের বিশাল ভূখণ্ডের (অর্থাৎ বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার) নাম হয় আমেরিকা।

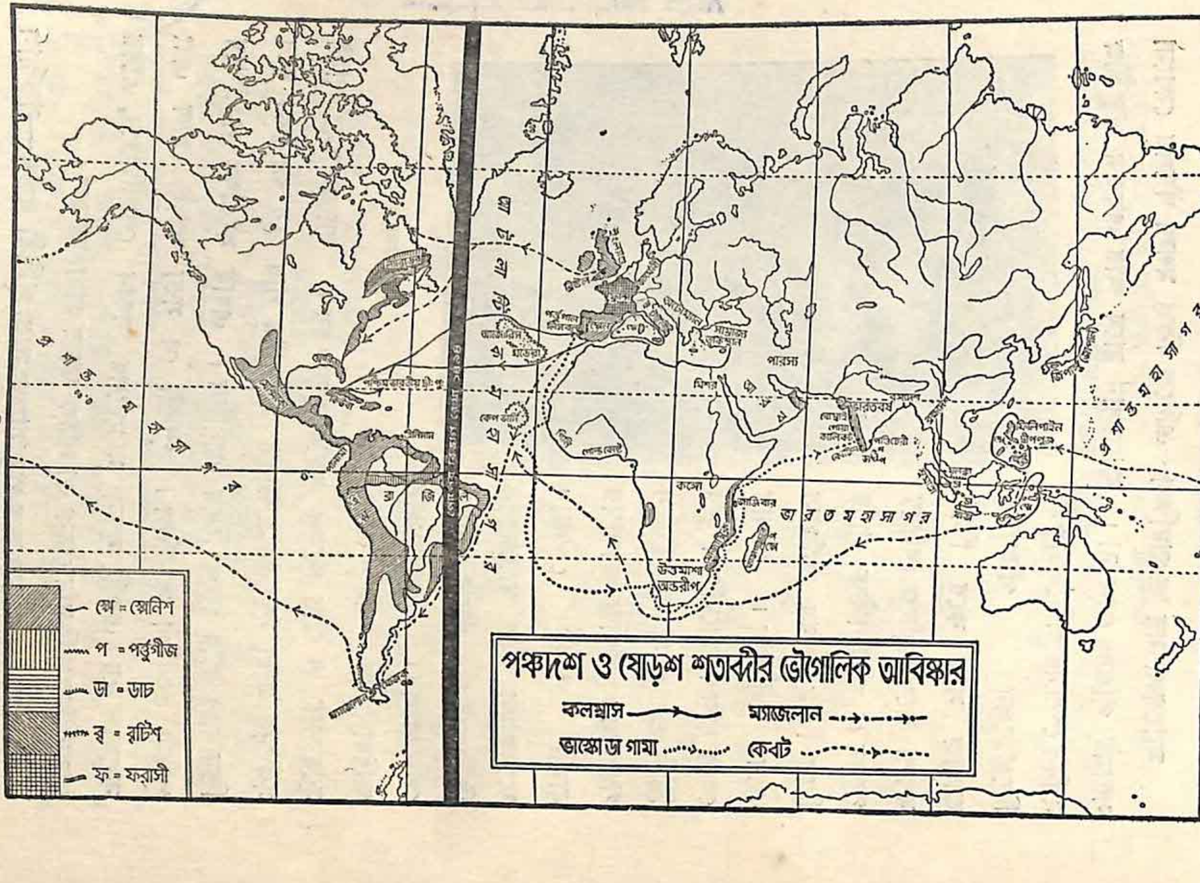
ম্যাজেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ—এদিকে কিন্তু মশলা দ্বীপের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। ম্যাজেলান নামে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক স্পেনের অধীনে চাকুরী নিয়েছিলেন। পাঁচখানি জাহাজ সঙ্গে করে তিনি মশলা দ্বীপের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তিনি প্রথম ব্রাজিলে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। প্রশান্ত মহাসাগর নামটি তাঁরই দেওয়া। অনেকদিন পরে ম্যাজেলান ফিলিপাইন দ্বীপে এসে পৌঁছোলেন। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে একটি



ম্যাজেলান

যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর অনেক সঙ্গীর মৃত্যু হয়। ম্যাজেলানের বাকী সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন ভারত মহাসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে তিন বছর পরে দেশে ফিরে এসেছিল। এরাই সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল। পৃথিবী যে সত্য সত্যই গোল এবং কলম্বাস যে একটি নূতন মহাদেশের সন্ধান পেয়েছিলেন, এদের দুঃসাহসিক অভিযান থেকে তা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হল।

পোপ কর্তৃক স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে পৃথিবী বণ্টন—পর্তুগাল


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কার
কলম্বাস
ম্যাজেলান
ভাস্কো ডা গামা
কেবট
স্পে = স্পেনিশ
প = পর্তুগীজ
ডা = ডাচ
বৃ = বৃটিশ
ফ = ফরাসী
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
পারস্য
মিশর
কঙ্গো
উত্তমাশা অন্তরীপ
ভারতবর্ষ
জাঞ্জিবার

ও স্পেন তাদের আবিষ্কৃত দেশগুলিতে একচেটিয়া ব্যবসা করবার অধিকার দাবী করত। এতে তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। তখন পর্যন্ত ধর্মগুরু পোপের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর উপর একটি কাল্পনিক রেখা টেনে দেওয়া হল। এর পূর্ব অংশে পর্তুগীজরা আর পশ্চিম অংশে স্পেনবাসীরা একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অধিকার পেল।

ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তার: পর্তুগাল ও স্পেন—পর্তুগীজরা ক্রমে আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কুঠি স্থাপন করে একটি বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ইতিমধ্যে **কর্তেজ** নামে এক যোদ্ধা মেক্সিকো জয় করে সেখানে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করেন। **পিজারো** নামে আর একজন যোদ্ধা পেরুতেও স্পেনের অধিকার স্থাপন করেছিলেন। এরপর আস্তে আস্তে সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকাই স্পেনের অধিকারে আসে। একমাত্র ব্রেজিল পর্তুগালের অধীন হয়। আমেরিকার ধনরত্ন আহরণ করে এবং সেখানকার রূপার খনিগুলি অধিকার করে স্পেনের অধিবাসীরা এই সময়ে ইউরোপে খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—স্পেন ও পর্তুগালের ঐশ্বর্য দেখে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদের মনে ঈর্ষা জেগে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ওলন্দাজ নাবিকেরা ভারতে আসবার পথের সন্ধান পায়। তারাও তখন প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য জাহাজ পাঠাতে আরম্ভ করল। ক্রমে তারা অনেকগুলি পর্তুগীজ বন্দর জয় করে এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সিংহল দ্বীপটিও তারা

কিছুকালের জন্য অধিকার করেছিল। এছাড়া উত্তর আমেরিকাতেও তারা কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

এদিকে ফরাসীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। তারা উত্তর আমেরিকাতে সেণ্ট লরেন্স ও মিসিসিপি নদীর উপত্যকার তটভূমি আবিষ্কার করে সেখানে ফ্রান্সের অধিকার স্থাপন করে। আফ্রিকা ও ভারতবর্ষেও তারা কয়েকটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছিল।

কলম্বাসের প্রথম আমেরিকা যাত্রার প্রায় পাঁচ বছর পরে (১৪৯৭ খ্রীঃ) **জন কেবট** নামে একজন ইটালী দেশীয় নাবিক উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু এরপরে ইংরাজরা প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত আর বিশেষ কিছু করতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে তারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। এই একই সময়ে তারা ভারতবর্ষে এবং আফ্রিকাতেও বাণিজ্য-ঘাঁটি স্থাপন করে তাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিল।

নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল—নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের বাণিজ্য-জগতে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দেয়। ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্যপথ তখন প্রায় পরিত্যক্ত হল; তার পরিবর্তে আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগরের পথে জগদ্ব্যাপী বহির্বাণিজ্য শুরু হয়ে গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতাও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময় থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৪৮৮—বার্থোলোমিউ দিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার

১৪৯২—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

১৪৯৮—ভাস্কো দা গামার ভারতে আগমন

১৫১৯-২২—ম্যাজেলান ও তাঁর সঙ্গীদের ভূ-প্রদক্ষিণ

অনুশীলনী

১। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে কেন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল? ইউরোপীয়রা তখন প্রাচ্যদেশে আসবার জন্য কেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল?

২। পর্তুগীজ নাবিকেরা কোন্ কোন্ নূতন দেশ আবিষ্কার করেছিল? কয়েকজন প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিকের নাম কর।

৩। আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেন? কার নামে এই মহাদেশের নাম হয়েছে? কে সর্বপ্রথম জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন?

৪। কোন্ কোন্ স্থানে পর্তুগীজ ও স্পেন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল? ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজরা কোন্ কোন্ জায়গায় উপনিবেশ ও বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেছিল?

৫। নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের কি ফল হয়েছিল?

তৃতীয় অধ্যায়

মুঘল শাসনে ভারত

ইউরোপের ধর্মসংস্কারের যুগে আমাদের দেশে মুঘল-বংশীয় সম্রাটগণ রাজত্ব করতেন। তাঁরা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মুঘল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহামতি আকবর। কারণ তিনিই এর ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছিলেন।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবর—আকবরের পিতামহ বাবর সর্বপ্রথম ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা মধ্য এশিয়ায় বাস করতেন। বাবরের পিতা ছিলেন দুর্ধর্ষ তৈমুর লঙ্গের বংশধর এবং তাঁর মাতা ছিলেন মোঙ্গল বীর চেঙ্গীস্ খাঁর বংশজাত। মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবর তাঁর পিতৃরাজ্য মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ফরগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু জ্ঞাতিদের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হয়ে তিনি কাবুল অধিকার করে



বাবর

সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁর ধন-ধান্যে ভরা হিন্দুস্থান জয় করবার আকাঙ্ক্ষা হয়। অক্লান্ত-কর্মী বাবরের এ আশা বিফল হল না। পাণিপথের প্রান্তরে পাঠান-সুলতান **ইব্রাহিম লোদীকে** পরাস্ত করে তিনি ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময়ে রাজপুতানার অন্তর্গত মেবারের বীর **রাণা সংগ্রাম সিংহ** তাঁকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের হাতে তাঁরও পরাজয় ঘটে। এরপর পাটনার কাছে আরেকটি যুদ্ধে পূর্ব ভারতের আফগান দলপতিদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে বাবর উত্তর ভারতে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এর চার বৎসরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বিজিত সাম্রাজ্যটিকে সুগঠিত করে যেতে পারেন নি।

হুমায়ুন ও শের শাহের দ্বন্দ্ব—বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার মতই সাহসী ও

বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের সবচাইতে বড় দোষ ছিল তাঁর অলসতা। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ এবং বিহারের শের খাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের বিরোধ দেখা দেয়। হুমায়ুনের হাতে বাহাদুরের পরাজয় হয়। কিন্তু পূর্ব ভারতে শের খাঁ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেন। তিনি বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। শক্তি সঞ্চয় করে তিনি এই অঞ্চলের দুর্ভেদ্য চুণার ও রোটাস দুর্গ অধিকার করেন এবং ক্রমে বঙ্গদেশের অধিকাংশও তিনি জয় করেন। হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর দুবার যুদ্ধ হয়েছিল। কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁ হুমায়ুনকে দারুণ ভাবে পরাজিত করেন। রাজ্যহারা হুমায়ুন পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে শেষে নিরুপায় হয়ে পারস্যে চলে যান।

শের খাঁ তখন শের শাহ্ উপাধি নিয়ে হিন্দুস্থানের সম্রাট হলেন। মুঘলদের নিকট থেকে তিনি আগ্রা, দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি জয় করে-ছিলেন। সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি মালব, রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ড জয় করেন। এই ভাবে তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের আধিপত্য লাভ করেছিলেন।


শের শাহ

শের শাহ্ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জায়গীরদারের পুত্র হয়েও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ভারতের সিংহাসনে বসেছিলেন। শুধু বিখ্যাত যোদ্ধা হিসাবেই নয়, দক্ষ শাসক-রূপেও তিনি ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। শের শাহ

শাসন-ব্যবস্থার বিস্তৃত সংস্কার সাধন করেছিলেন। শাসনের সুবিধার জন্য তিনি নিজ রাজ্যটিকে কতকগুলি প্রদেশ ও সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। রাজ্যের সমস্ত জমি তিনিই সর্বপ্রথম জরীপ করিয়ে রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি দেশের পথঘাটগুলির উন্নতি সাধন করান। পথিকদের জন্য রাস্তার দুপাশে কূপ ও সরাইখানা নির্মিত হয়। মুদ্রা ও ডাক বিভাগের এবং দেশে শান্তিরক্ষার জন্য সৈন্য বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীরও তিনি সংস্কার সাধন করেন। শের শাহ্ ছিলেন মনেপ্রাণে ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। বড় বড় রাজকর্মচারীরাও অন্যায় করলে কঠিন শাস্তি পেতেন। পরবর্তী কালে মহামতি আকবর শের শাহের শাসননীতি অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন।

শের শাহ মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর বংশধরেরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে হুমায়ুন ভারতে প্রবেশ করে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করলেন। ভারতে মুঘল রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু হুমায়ুন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারলেন না; কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আকবরের সিংহাসনে আরোহণ ঃ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ— ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে হুমায়ুনের পুত্র আকবর মুঘল সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়। শের শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মহম্মদ আদিল শাহ্। তাঁর এক হিন্দু সেনাপতি হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মুঘলদের হাত থেকে দিল্লী ও আগ্রা জয় করে নিয়েছিলেন। ফলে বিখ্যাত পাণিপথের প্রান্তরে মুঘল-পাঠানে দ্বিতীয় বার ভাগ্যপরীক্ষা হল। হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন।

এরপর পাঠান শক্তির পুনরুত্থানের আর কোন সম্ভাবনা থাকল না। এইজন্যই আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

রাজ্যবিস্তার—পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পর আকবর সাম্রাজ্য-বিস্তারে উদ্যোগী হন। একে একে আজমীঢ়, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর সেনাপতিরা মালব এবং গণ্ডোয়ানা রাজ্যের কিছু অংশ জয় করলেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং বন্দী হবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন।



আকবর

আকবর এবার রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট বুঝেছিলেন যে দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সহায়তা ব্যতীত মুঘল সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না। তাই তিনি রাজপুতকন্যা বিবাহ করে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। অম্বরের রাজপুত্র মানসিংহ তাঁর সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু মেবারের স্বাধীনতাপ্রিয় রাণারা আকবরের অধীনতা মানতে চাইলেন না। কাজেই আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করে কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি অধিকার করে নিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সেলিমের হাতে রাণা প্রতাপসিংহের পরাজয় হয়। কিন্তু এরপরেও দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে এই বীর রাণা মেবার উদ্ধারের জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্ধর্ষ মুঘল সেনার কাছে পরাজিত হলেও ইতিহাসে প্রতাপের বীরত্বের খ্যাতি আজও অমর হয়ে আছে।

আকবর ক্রমে পশ্চিমে গুজরাট থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন। কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ প্রভৃতিও একে একে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। বঙ্গ-বিজয়ের প্রায় পনেরো বছর পরে আকবর উড়িষ্যা জয় করেন।

উত্তর ভারত বিজয় সমাপ্ত হবার পর আকবর দক্ষিণ ভারতেও রাজ্যবিস্তার করতে চেষ্টা করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজারা এই সময়ে আত্মকলহে মত্ত ছিলেন। এই সুযোগে আকবর বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগরের কিছু অংশ জয় করলেন। আহমদনগরের চাঁদ সুলতানা নারী হয়েও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসীম বীরত্ব সত্ত্বেও আহমদনগর আকবরের পদানত হয়। এইভাবে পারস্যের পূর্বসীমান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও হিমালয় পর্বত থেকে গোদাবরী পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

আকবরের কৃতিত্ব—আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা খুব শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের—স্কন্ধ ও বক্ষ প্রশস্ত, দীর্ঘ বাহু, দিব্য কান্তি, প্রদীপ্ত চক্ষু ; স্বভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ, সরল ও অমায়িক। তাঁর শারীরিক বল, বুদ্ধি এবং সাহসও ছিল অসীম।

আকবর শুধু রাজনীতিজ্ঞই ছিলেন না ; ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ধর্মালোচনার জন্য তিনি ফতেপুর সিক্রীতে **ইবাদৎখানা** নামে একটি উপাসনাগার নির্মাণ করেন। এখানে বিভিন্ন ধর্মমতের পণ্ডিতগণ একত্র হয়ে তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। আকবর সর্ব-ধর্ম-সমন্বয় করবার ইচ্ছায় **দীন-ইলাহী** নামে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে উদ্যম সফল হয়নি।

শাসক হিসাবেও আকবর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে সুদৃঢ়রূপে গড়ে উঠেছিল। শের শাহের মত তিনিও শাসন বিভাগের সংস্কার করেন এবং হিন্দুদের উপর থেকে তীর্থকর ও জিজিয়াকর তুলে দিয়ে তাদের প্রীতিভাজন হন। আকবরের অপক্ষপাত শাসনে ভারতবর্ষে জাতিধর্মের কলহ দূর হয়ে গিয়ে এক অখণ্ড জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

জাহাঙ্গীর—আকবরের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত তিনিও রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর শাসন কালে মানসিংহ প্রভৃতি মুঘল সেনাপতিরা বাংলাদেশ, মেবার ও আহ্মদ-নগর জয় সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সময়ে পারস্য-সম্রাট মুঘলদের হাত থেকে কান্দাহার কেড়ে নেন।



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বহু পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। ন্যায়পরায়ণ, স্নেহশীল ও অমায়িক হয়েও মাঝে মাঝে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। শিল্প-সাহিত্যে জাহাঙ্গীরের অনুরাগ ছিল প্রবল। তিনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর আত্মজীবনী "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী" থেকে তাঁর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মবিষয়ে তিনি পিতার মতই উদার ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন সম্প্রদায়কেই তিনি সম্মান করতেন। রাজ্যের দীনতম প্রজাও যাতে সম্রাটের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে পারে, সেইজন্য তিনি ষাটটি ঘণ্টা-যুক্ত একটি সোনার

শিকল আগ্রা দুর্গের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বিচারপ্রার্থীরা ঐ শিকল নেড়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।



শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহান—জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ্‌জাহান হিন্দুস্থানের সম্রাট হন। সিংহাসন লাভের পরে তিনি রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেন এবং কান্দাহার ও মধ্য এশিয়ায় তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজধানী সমরকন্দ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা এই সময়ে মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

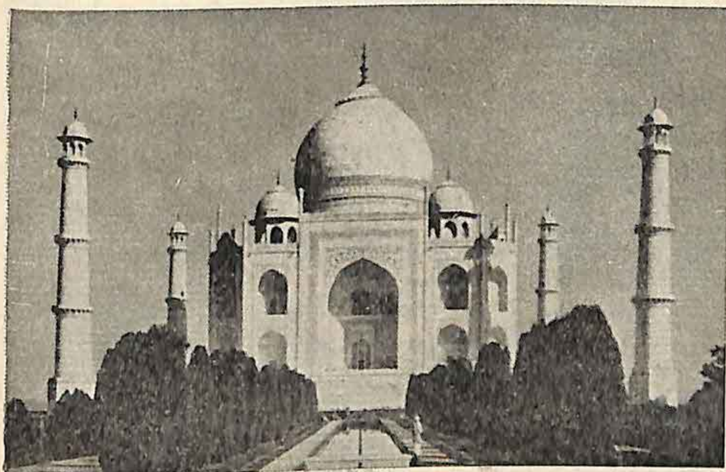
যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল শিল্পোন্নতি,



দেওয়ানী আমের রাজসিংহাসন

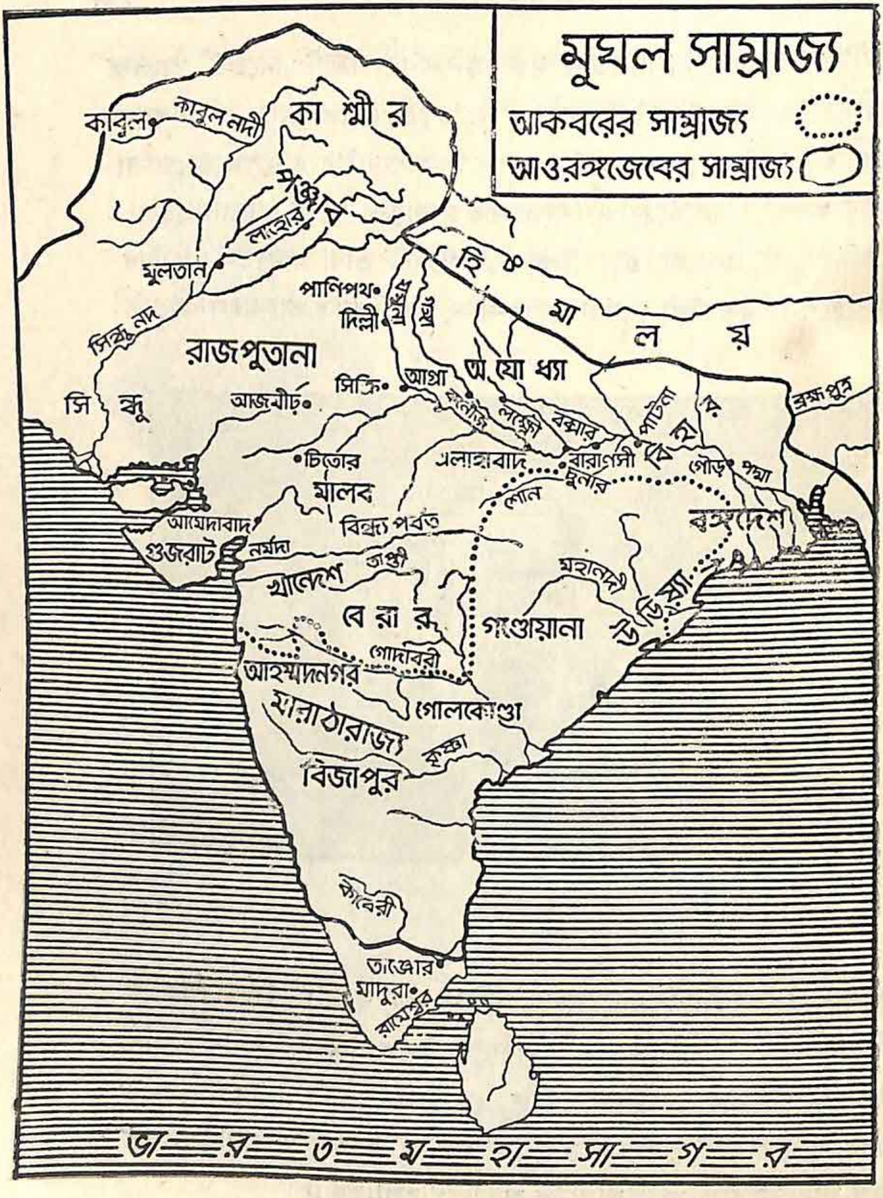
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, ভারত সরকার

জাঁকজমক এবং বিলাসিতার জন্য প্রসিদ্ধ। সম্রাট নিজেই অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মুকুটে শোভা পেত জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর হীরক ; বহুরত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন তাঁর রাজসভার শোভা বর্ধন করত। সাহিত্যে ও শিল্পে শাহ্‌জাহানের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি তুর্কী, ফরাসী এবং হিন্দী এই তিনটি ভাষা জানতেন। তাঁর আদেশে নির্মিত দিল্লী দুর্গের দরবার-কক্ষ, বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল প্রভৃতি



তাজমহল

আজও তাঁর গভীর শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করে। কিন্তু পিতা ও পিতামহের মত শাহ্‌জাহান ধর্মবিষয়ে উদার ছিলেন না। তিনি কতকগুলি হিন্দু দেবালয় ভেঙ্গে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন। এসব সত্ত্বেও শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর শাসনকালকে মুঘল শাসনের সুবর্ণ-যুগ বলা হয়।


মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাবুল নদী
কা শ্মী র
পঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
পাণিপথ
দিল্লী
সিন্ধু নদ
রাজপুতানা
সি ন্ধু
আজমীঢ়
সিক্রি
আগ্রা
হি মা ল য়
অ যো ধ্যা
লক্ষ্ণৌ
বক্সার
পাটনা
ব্রহ্মপুত্র
এলাহাবাদ
বারাণসী
চুনার
গৌড়
পদ্মা
চিতোর
মালব
শোন
বিন্ধ্য পর্বত
আমেদাবাদ
গুজরাট
নর্মদা
বঙ্গদেশ
তাপ্তী
খান্দেশ
মহানদী
বে রা র
গণ্ডোয়ানা
গোদাবরী
আহম্মদনগর
গোলকোণ্ডা
মারাঠারাজ্য
কৃষ্ণা
বিজাপুর
কাবেরী
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বর
ভা র ত ম হা সা গ র

বৃদ্ধ বয়সে শাহ্‌জাহান অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে তাঁর তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব অপর তিন ভাই দারা, সুজা ও মুরাদকে যুদ্ধে পরাজিত এবং পিতাকে বন্দী করে নিজে সম্রাট হন।

ঔরংজেবের রাজ্য বিস্তার—ঔরংজেব 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবরের মত তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আসামের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যদুটিকেও তিনি সম্পূর্ণ-রূপে জয় করেন। এর পর সুদূর তাঞ্জোর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।


ঔরংজেব

মুঘল-বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান—ঔরংজেব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, কার্যকুশল ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর মত সাহসী ও রণকৌশলী সেনাপতিও খুব কম দেখা যায়। রাজ্যের সমস্ত কাজ তিনি নিজেই দেখা-শুনা করতেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে ঔরংজেব ভয়ানক গোঁড়া ছিলেন। পবিত্র কোরাণের প্রত্যেকটি উপদেশ তিনি মেনে চলতেন। তাঁর আদেশে রাজসভায় নাচ, গান, আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পরধর্মের প্রতি উদারতা তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি হিন্দুদের দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করবার আদেশ দেন, এবং তাদের উপর আবার জিজিয়া কর প্রবর্তন করেন।

সম্রাটের এই রকম ধর্মান্ধতার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মুঘল-বিরোধী শক্তির অভ্যুত্থান হয়। মেবারের রাণা রাজসিংহ এবং

রাঠোর দুর্গাদাসের অধিনায়কত্বে **রাজপুত** জাতি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ফলে তাদের সহযোগিতা হারিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ল।

পঞ্জাবের **শিখেরাও** এই সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিখসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। গুরু নানক এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। আকবর শিখধর্মগুরুদের রীতিমত সম্মান করতেন। কিন্তু ঔরংজেবের সময়ে গুরু তেগবাহাদুরকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন দিতে হয়। তখন নবম গুরু গোবিন্দের অধীনে শিখেরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং ক্রমে পঞ্জাবে মুঘলদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ—এদিকে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গেও মুঘলদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মারাঠাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিলেন **শিবাজী**। তিনি ছিলেন পুণা এবং কর্ণাটকের জায়গীরদার শাহজীর পুত্র। কিশোর বয়সে তিনি পার্বত্য মাওয়ালী জাতীয় লোকদের নিয়ে একটি নিজস্ব সৈন্যদল গঠন করেন। এদের সাহায্যে তিনি ক্রমে বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিয়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়ে তুললেন। ফলে মুঘলদের সঙ্গে তাঁর সজ্ঘর্ষ বাধে। কয়েকটি যুদ্ধের পর ঔরংজেবের সেনাপতি জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী আগ্রায় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু সম্রাট তাঁকে অপমান


শিবাজী

করে আগ্রাতে নজরবন্দী করে রাখেন। শিবাজী কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠাদের সঙ্গে ঔরংজেবের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মারাঠা রাজ্যের অধিকাংশ মুঘলদের হাতে আসে। শিবাজীর পুত্র শম্ভাজী যুদ্ধে বন্দী হয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এর পরে শিবাজীর আর এক পুত্র রাজারাম ও তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব করেন। ঔরংজেব তাদের দমন করতে পারলেন না। শেষে তাঁর মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যের অধিপতি হন শম্ভাজীর পুত্র শাহু।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—এদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। আকবর হিন্দুদের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ও রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে-ছিলেন। কিন্তু ধর্মান্ধ ঔরংজেবের ব্যবহারে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়। মুঘলদের চিরবন্ধু রাজপুতেরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এইভাবে ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। এছাড়াও সাম্রাজ্য পতনের আরও কয়েকটি কারণ ছিল। বিলাসিতা ও সেনাপতিদের মধ্যে কলহের জন্য মুঘল সেনাবাহিনী ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেও ঔরংজেব ভুল করেছিলেন। কেন না তখনকার দিনে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। কাজেই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর এর সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেন। সাম্রাজ্যের এই রকম দুরবস্থা দেখে বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ **নাদির শাহ** দিল্লী অধিকার করে লুণ্ঠন করলেন। তাঁর সৈন্যদের

হাতে রাজধানীর দেড়লক্ষ নরনারী নিহত হল এবং বাড়ীঘর, হাটবাজার সব ভস্মস্তূপে পরিণত হল। অবশেষে সম্রাট মহম্মদ শাহের কাতর অনুরোধে নাদির দিল্লী ত্যাগ করেন—কিন্তু যাবার সময়ে তিনি শাহ্‌জাহানের ময়ূর সিংহাসন, এবং প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন নিয়ে যান। নাদিরের আক্রমণের কিছুকাল পরে আফগানিস্থানের রাজা আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী মুঘলদের হাত থেকে পঞ্জাব কেড়ে নেন। তিনি আরও কয়েকবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং আবার দিল্লী লুঠ করেছিলেন। এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

মুঘল আমলে শাসন-ব্যবস্থা—মুঘল আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। শাসন ব্যাপারে আকবর অনেক বিষয়ে শের শাহের নীতিগুলি অনুসরণ করে চলেছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যটিকে ১৫টি 'সুবা' (প্রদেশ) ও প্রত্যেকটি সুবাকে কয়েকটি 'সরকার' (জেলা)-এ বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সুবায় সুবাদার নামে একজন শাসনকর্তা ও একজন 'দেওয়ান' বা রাজস্ব-সচিব থাকতেন। সুবাদারকে তাঁর শাসিত প্রদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকতে হত।

প্রত্যেক সরকারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন একজন ফৌজদার। নগরের শান্তি রক্ষার ভার থাকত কোতোয়ালের উপর। সম্রাটেরা অনেকেই ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন 'কাজী'। প্রাদেশিক কর্মচারীরা যাতে এক জায়গায় বেশীদিন থেকে স্থানীয় প্রতিপত্তি গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য তাদের বদলী করা হত।

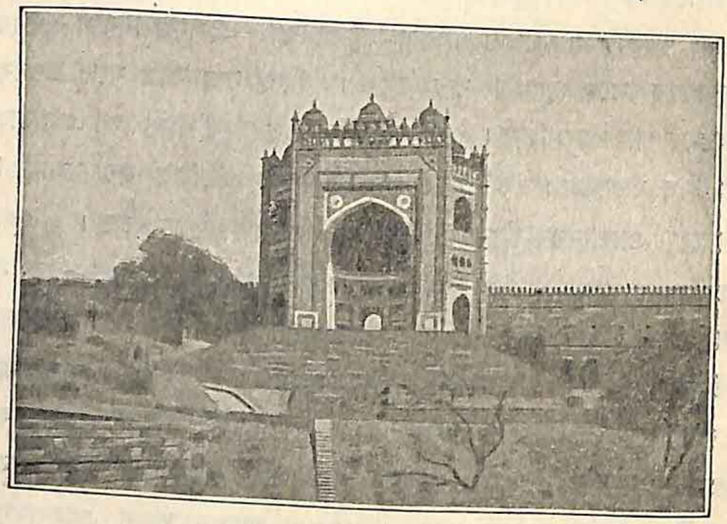
আকবরের আদেশে রাজা তোডরমল শের শাহের অনুকরণে

রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করান এবং উর্বরতা অনুযায়ী জমি-গুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেন। ফসলের মোট এক-তৃতীয়াংশ ছিল সম্রাটের প্রাপ্য। কৃষকেরা নগদ টাকা অথবা শস্য দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত।

মুঘল যুগের শাসন-ব্যবস্থা আজও ভারতে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। এখনকার অনেকগুলি প্রদেশ ও জেলার সৃষ্টি সেই সময়ে হয়েছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত অনেক নিয়মও সেই সময় থেকে চলে আসছে। মুঘল যুগে প্রাদেশিক কর্মচারীদের বদলী করবার প্রথা এবং সরকার ও নগরের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা—এ সমস্ত বিষয়ে এখনকার ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু এখনকার সঙ্গে তখনকার অনেক পার্থক্যও ছিল। তখন সম্রাটেরা শুধু দেশে শান্তিরক্ষা এবং রাজস্ব আদায় করতেন। জীবনের অন্যান্য দিকে উন্নতির জন্য অধিকাংশ সময়ে প্রজাদের নিজের উপরেই নির্ভর করতে হত। এছাড়া তখনকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী, এখনকার মত গণতান্ত্রিক নয়। সম্রাটেরা নিজেদের ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করতেন। কোন বিষয়েই তাঁরা কারো কাছে দায়ী ছিলেন না। প্রদেশগুলিতে সুবাদার ও দেওয়ানদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপর নজর রাখতে হত—যাতে কেউ অতিরিক্ত ক্ষমতা-শালী হয়ে উঠতে না পারেন। রাজস্ব আদায় ছাড়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে শাসনকর্তাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। এইজন্য শাসন ব্যাপারে গ্রামবাসীরা কতকটা স্বাধীন ছিল এবং ছোট ছোট ব্যাপারে বিচার ও গ্রামের শান্তিরক্ষা প্রভৃতি তারা নিজেরাই করে নিত।

মনসবদারী প্রথা মুঘল যুগের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্বে রাজকর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হত।

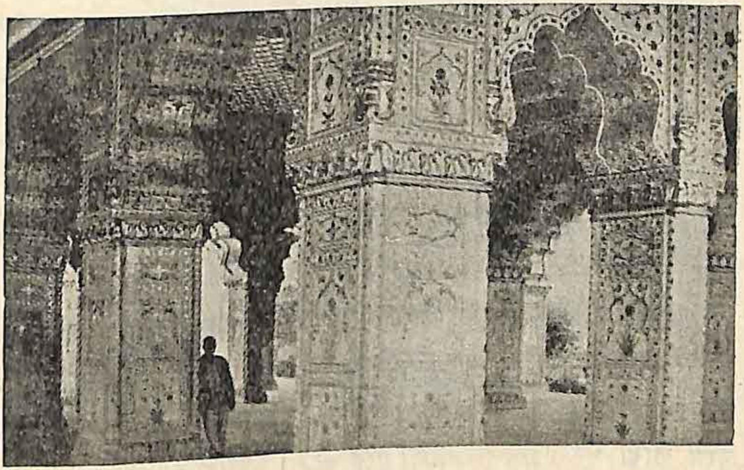
এতে কর্মচারীদের আর্থিক এবং স্থানীয় প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পেত, সম্রাটের রাজস্বেরও তেমনি ক্ষতি হত। আকবর জায়গীর-প্রথা উচ্ছেদ করে মনসবদার নামে এক উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। এরা তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং রাজ-সরকার থেকে বেতন পেত। শাসনকার্যে সহায়তা করা ছাড়াও প্রত্যেক মনসবদারকে রাজসরকারের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করতে হত। প্রজারা ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতিগুলি পালন করছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার জন্য একজন 'মুহ্‌তাসিব' নিযুক্ত ছিলেন।



বুলন্দ দরওয়াজা

মুঘল যুগের সংস্কৃতি—মুঘল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়েছিল। সম্রাটেরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমান সমাদর করতেন। এইজন্য সে সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব

সমন্বয় হয়। আকবরের সময়ে রাজপুত শিল্পী ও ভাস্করদের প্রাসাদ-নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পনীতি মিলিয়ে তারা এক নূতন ধরনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সৃষ্টি করে। আকবরের আমলে বুলন্দ দরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদ এবং সিকান্দ্রায় সম্রাটের নিজের পরিকল্পিত সমাধি মন্দির, শাহ্‌জাহানের সময়ের আগ্রা দুর্গ, আগ্রার তাজমহল, দিল্লী দুর্গের দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, জাম-ই-মসজিদ প্রভৃতি মুঘল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।



দেওয়ান-ই-খাস

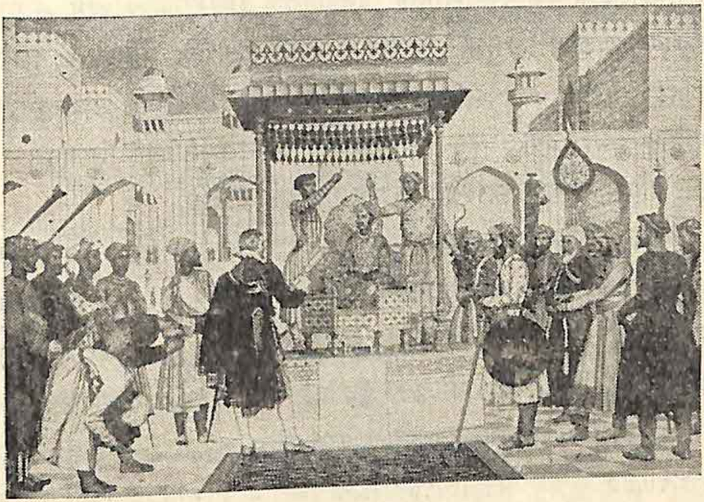
এই যুগের চিত্রশিল্পেও রাজপুত এবং পারস্য রীতির সংমিশ্রণ হয়েছিল। বাবর এবং হুমায়ুন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে ছবি আঁকতেন। আকবর বহু হিন্দু এবং পারসিক চিত্রকরদের সভায় আহ্বান করে নূতন চিত্রকলার সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। আকবরের উৎসাহে সঙ্গীতশিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয়।

তাঁর সভায় প্রসিদ্ধ তানসেন ও মালবরাজ বাজবাহাদুর হিন্দী সঙ্গীত এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারদর্শিতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

বাবর থেকে আরম্ভ করে মুঘল সম্রাটগণ প্রায় সকলেই বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এইজন্য মুঘল যুগে বহু ফারসী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাবর এবং জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' প্রভৃতি মুঘল যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। আকবরের আদেশে রামায়ণ এবং মহাভারত ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল। মুঘল আমলে হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়। সুরদাস এবং তুলসীদাস হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য চরিতামৃত, পদাবলী, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই আমলে রচিত হয়। এই যুগে আকবরের উদার নীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমানেরা অনেক কাল একত্র শান্তিতে বসবাস করে এবং পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

পাশ্চাত্য বণিকদের ভারতে আগমন—মুঘল যুগে বহু ইউরোপীয় বণিক ভারতে আসে এবং বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজেরা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই এসেছিল। মুঘল যুগে তারা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দামন, দিউ, বোম্বাই এবং বাংলা দেশের হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ কুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগীজেরা শেষ পর্যন্ত দস্যুতে পরিণত হয়। দক্ষিণবঙ্গ পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে ছারখার হয়ে যায়। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট শাহ্‌জাহান তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন। এর ফলে ভারতে পর্তুগীজদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়।

আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে রাণী এলিজাবেথের সনন্দ নিয়ে **ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** নামে একদল ইংরাজ বণিক সর্বপ্রথম এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। এরপরে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সভা থেকে **টমাস রো** নামে একজন রাজদূত এসে কিছুদিন জাহাঙ্গীরের সভায় বাস করেন। সম্রাট টমাস রোকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ইংরাজরা আগ্রা, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়।



জাহাঙ্গীরের রাজসভায় টমাস রো

সবার শেষে আসে ফরাসীরা। তারা প্রথমে সুরাটে এবং মসুলিপত্তনে কুঠি স্থাপন করে এবং পরে পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরেও ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। এই সব ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল, কিন্তু এই বাণিজ্য ক্রমে ভারতীয় এবং আরব বণিকদের হাত থেকে ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়।

মুঘল আমলে জীবনযাত্রা—বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আবুল ফজল, বদাউনী, কাফি খাঁ প্রভৃতির লেখা ইতিহাস, টেভার্নিয়ার, বার্ণিয়ার প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ, এবং তখনকার সাহিত্য থেকে মুঘল যুগের জীনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। দিল্লী ও আগ্রা ছিল তখন ভারতের রাজধানী। সেখানে বড় বড় অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য লোকজনে পূর্ণ ছিল। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বড় বড় আমীর ওমরাহ্‌গণ রাজধানীতে বাস করতেন। সম্রাটরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তাঁরা নৃত্যগীত, মল্লযুদ্ধ ও বন্যজন্তুর লড়াই দেখত এবং নানারকম জাঁকজমক দেখাতে ভালবাসতেন। আমীর ওমরাহেরাও খুব বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। এই জন্য রাজধানী সব সময়েই আনন্দে মুখরিত থাকত।

তখন সমাজ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ধনী সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং জনসাধারণ। অভিজাত শ্রেণীর অর্থের প্রাচুর্য ছিল। তাঁরাও সর্বদা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণীর লোকেরা খুব পরিশ্রমী ছিল এবং সাদাসিধা জীবন যাপন করত। জনসাধারণের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের সীমা ছিল না। সাধারণ লোকের অন্ন-বস্ত্রেরও সংস্থান ছিল না। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপত্তিতে তাদের দুর্দশার সীমা থাকত না। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে এবং গুজরাটে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করে ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লিখেছেন যে, "এ সময়ে মানুষ মানুষের মাংস, এমন কি পিতামাতা সন্তানের মাংস খেতে দ্বিধা বোধ করত না। রাস্তাঘাট মৃতদেহের স্তূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

বহির্বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হওয়ায় দেশে ধন-রত্নের অভাব ছিল না।

ঢাকার মসলিন এবং বাংলার রেশমের চাহিদা ছিল সারা ইউরোপে। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে এই ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি দেখা যেত। দেশে চাল, ডাল, মাছ, মাংসের দাম খুব সস্তা ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় তাদের অভাবের মধ্যেই দিন কাটাতে হত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা—আর জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও দুর্দশা—এই ছিল মুঘল যুগের সমাজ-চিত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই সময়ে আমরা প্রায় একই চিত্র দেখতে পাই।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৫২৬—পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ; মুঘল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
১৫৩৯-৪০—শের শাহ্ ও হুমায়ুনের দ্বন্দ্ব ; হুমায়ুনের পরাজয়
১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল
১৫৫৬—পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৬০০—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা
১৬০৫-২৭—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
১৬২৮-৫৮—শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল
১৬৫৮-১৭০৭—ঔরংজেবের রাজত্বকাল
১৬৬৪—শিবাজীর 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ
১৭৩৯—নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণ
১৭৪৭—আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর ভারত আক্রমণ

অনুশীলনী

১। মুঘল সম্রাটদের পূর্বপুরুষগণ কোথায় বাস করতেন? কে ভারতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। হুমায়ুন ও শের শাহের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কি জান? শের শাহ্ কি জন্য ভারতের ইতিহাসে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন?

৩। আকবরের রাজ্য-বিস্তার ও তার সীমানা বর্ণনা কর।

৪। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের চরিত্র সম্বন্ধে কি জান?

৫। কি ভাবে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল? মারাঠাদের সঙ্গে ঔরংজেবের কেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়?

৬। আকবর ও ঔরংজেবের হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার তুলনা কর। ঔরংজেবের অন্য ধর্মের প্রতি অনুদারতার কি ফল হয়েছিল?

৭। ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল? এই সাম্রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণগুলি নির্দেশ কর।

৮। মুঘল আমলের (ক) শাসন-ব্যবস্থা, (খ) সংস্কৃতি ও (গ) জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান? কি ভাবে আমরা মুঘল যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারি?

৯। মুঘল যুগে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি এদেশে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল? স্যার টমাস রো কে? তিনি কোন্ সময়ে এবং কেন এদেশে এসেছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়

ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব

টিউডর রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা—মুঘলদের সময়ে ইংল্যাণ্ডে টিউডর-বংশীয় রাজা ও রাণীরা রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজত্বকাল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এই সময়েই এখানকার অধিবাসীরা রেনেসাঁসের মহান প্রেরণা লাভ করেছিল—যার ফলে আমরা সেখানে শেক্সপীয়ারের মত সাহিত্যিক ও বেকনের মত দার্শনিকের

আবির্ভাব দেখতে পাই। ইংল্যাণ্ডের ধর্মসংস্কারও এই যুগেই হয়েছিল। আবার নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব প্রসার হতে থাকে। এই সকল ঘটনা ও পরিবর্তনের ফলে ছোট ছোট জমিদার, এবং বণিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তখন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা দেশ শাসনে অংশ গ্রহণ করবার কামনা করত। দীর্ঘকাল আন্দোলন ও সংগ্রামের পর তারা রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। এর ফলে শাসন-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছিল তাকেই ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়।

টিউডরদের জনপ্রিয়তা—টিউডর বংশীয় রাজা ও রাণীদের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম হেনরী এবং এলিজাবেথের নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁরা রাজশক্তি বৃদ্ধি করে অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজনীতিজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। তাঁরা দেশে সুশাসন ও শান্তি স্থাপন করেন, ব্যবসায়ী ও বণিকদের উৎসাহ দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন, এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন। এঁদের আর একটি গুণ ছিল—পারতপক্ষে এঁরা প্রজাদের অপ্রীতিকর কোনও কাজ করতেন না। কাজেই স্বেচ্ছাচারী হলেও টিউডর রাজা ও রাণীরা খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

স্টুয়ার্ট রাজত্বের প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা—এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে টিউডর শাসনের অবসান হয়। তখন তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্কটল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম জেম্‌স্ নামে পরিচিত হন। স্টুয়ার্ট রাজারা বিদেশী ছিলেন বলে প্রজাদের অভিপ্রায় বুঝে কাজ করতে পারতেন

না ; ইংল্যাণ্ডবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাঁদের বিশেষ কোন সহানুভূতি ছিল না। টিউডরদের মত তাঁদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ছিল না। অথচ টিউডরদের মত তাঁরাও স্বেচ্ছাচারী ভাবে রাজত্ব করবার দাবী করতেন। এদিকে দেশের জাতীয় মহাসভা পার্লামেণ্টে এই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা স্বেচ্ছাচারী স্টুয়ার্ট রাজশক্তিকে খর্ব করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল।

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের কারণ—প্রথম জেম্‌স্ মনে করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তাঁর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ঈশ্বরের দান ; সুতরাং তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো কাছে দায়ী নন। প্রজাদের পক্ষে রাজকার্যের সমালোচনা করা দেবনিন্দার মতই গর্হিত বলে তাঁর ধারণা ছিল। আবার বহুকাল থেকে পার্লামেণ্ট কর ধার্য করবার ক্ষমতা দাবী করে আসছিল। কিন্তু জেম্‌স্ ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস্ পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতেই প্রজাদের কাছ থেকে নানা ভাবে কর আদায় করতেন। কোনো লোক রাজার বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখা হত। পার্লামেণ্টে রাজকার্যের সমালোচনা হত বলে তাঁরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক সময়েই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতেন। এদিকে যখনই কোনো কারণে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকা হত, তখনই সদস্যরা নানা রকম শাসন-সংস্কারের দাবী করত। কিন্তু জেম্‌স্ বা চার্লস্



প্রথম জেম্‌স্

কেউই তাতে কর্ণপাত করতেন না। এই সব কারণে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

প্রজার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আবেদন (Petition of Right)—প্রথম জেম্‌স্ যতবারই পার্লামেণ্ট আহ্বান করেছিলেন ততবারই তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে তিনি অধিবেশন ভেঙ্গে দেন। প্রথম চার্লস্‌ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শেষে বেআইনী উপায়েও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ তৃতীয়বার পার্লামেণ্ট ডাকেন। কিন্তু সদস্যরা অর্থ দেবার পরিবর্তে রাজার কাছে প্রজার ন্যায্য অধিকার সংক্রান্ত এক আবেদন পত্র (Petition of Right) দাখিল করলেন। এতে রাজাকে জানান হল যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কর বা ঋণ গ্রহণ, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা, গৃহস্থদের বাড়ীতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈন্য রাখা এবং শান্তির সময়ে সামরিক আইন জারী করা—এসবই অবৈধ বলে পরিগণিত হবে। অর্থের প্রয়োজনে চার্লস্ এই শর্তগুলি মেনে নিতে স্বীকার করলেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না; জোর করে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভেঙ্গে দিলেন।



প্রথম চার্লস্

চার্লসের স্বেচ্ছাচার—এরপর চার্লস্ দীর্ঘ এগারো বছর (১৬২৯-৪০) পার্লামেণ্টের অধিবেশন না ডেকেই স্বেচ্ছাচারী ভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। নানা রকম বেআইনী উপায়ে অর্থ-

সংগ্রহও চলতে লাগল। যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করল তাদের কারারুদ্ধ করে রাখা হল। ক্রমে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। তখন অর্থের অভাবে চার্লস্‌কে আবার পার্লামেণ্টের শরণাগত হতে হল।

লঙ্গ পার্লামেণ্ট—নূতন পার্লামেণ্ট কুড়ি বছর (১৬৪০-৬০) স্থায়ী হয়েছিল বলে ইতিহাসে এটি লঙ্গ পার্লামেণ্ট নামে বিখ্যাত। পিম ও হ্যাম্পডেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নেতাদের অধীনে মিলিত হয়ে সদস্যরা প্রথমেই চার্লসের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে দুজনের প্রাণদণ্ড হল। রাজা যাতে আর স্বেচ্ছাচারী ভাবে রাজত্ব করতে না পারেন সেইজন্য কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে স্থির হয় যে, এরপর তিন বছর অন্তর রাজাকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতেই হবে। কিছুদিন পরে কয়েকজন বড় বড় নেতা দাবী করলেন যে, রাজাকে কমন্স সভার বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে এবং প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার কতকগুলি পরিবর্তন করতে হবে। শেষের প্রস্তাব দুটি সকলের মনঃপূত না হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। চার্লস তখন পিম, হ্যাম্পডেন প্রভৃতি পাঁচজন চরমপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁরা তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার চরমপন্থী দল রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

গৃহযুদ্ধ—রাজার সঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রায় সাত বছর (১৬৪২-৪৯) ধরে যুদ্ধ চলেছিল। প্রথম দিকে রাজারই জয় হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে পার্লামেণ্টের পক্ষে একজন বীর সৈনিকের আবির্ভাব হয়। এঁর নাম **অলিভার ক্রমওয়েল**। তাঁর অসাধারণ সামরিক

প্রতিভা ছিল। একদল নূতন সৈন্য গঠন করে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষকে সম্পূর্ণ রকমে পরাজিত করলেন। রাজা চার্লস্ বন্দী হলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও চার্লস্ বিপক্ষ দলকে জব্দ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তখন পার্লামেণ্টের দলের লোকেরা আদালতে চার্লসের বিচার করে এবং তাঁর শিরশ্ছেদের আদেশ হয় (১৬৪৯)। মৃত্যুকালে চার্লস্ যথেষ্ট সাহস ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ক্রমওয়েলের দেশ-শাসন—চার্লসের মৃত্যুর পর রাজপদ তুলে দিয়ে সাধারণতন্ত্রের (Commonwealth) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু আসলে ক্রমওয়েল হয়ে উঠেছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তিনিও পার্লামেণ্টের ধার ধারতেন না। সেনাপতিদের সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করতেন। ক্রমওয়েল পিউরিটান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাই তিনি কোনরকম আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করতেন না। এইজন্য দেশের লোকেরা প্রাণ খুলে হাসি-তামাসায় যোগ দিতে সাহস করত না। ক্রমওয়েলের সময়ে ইংল্যাণ্ডে পিউরিটান ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল। এই সময়ে বিদেশেও ইংল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।



অলিভার ক্রমওয়েল

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ক্রমওয়েলের মৃত্যুর দু'বছর পরে (১৬৬০) প্রথম চার্লসের নির্বাসিত পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তখন আবার রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। পিতা ও পিতামহের মতই রাজার অধিকার সম্বন্ধে দ্বিতীয় চার্লসের উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না।

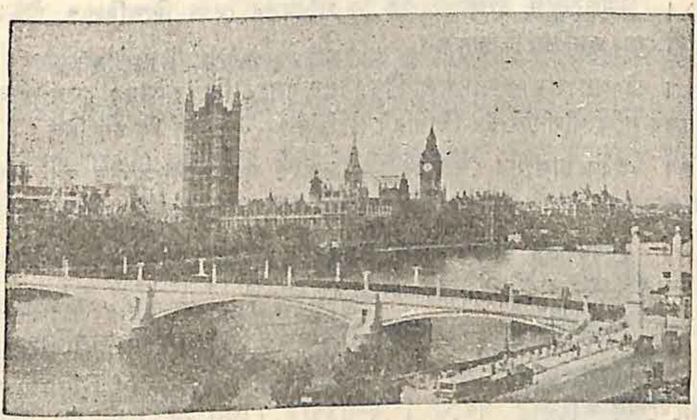
তাঁর পঁচিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তিনি মোটের উপর সদ্ভাব রেখে চলেছিলেন।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ ও গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)— দ্বিতীয় চার্লসের পর রাজা হন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্। তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। এইজন্য দেশের আইন অমান্য করে তিনি ক্যাথলিকদের প্রতি নানা রকম অনুগ্রহ দেখাতেন। এছাড়া তিনি প্রথম চার্লসের মত স্বেচ্ছাচারী ভাবে রাজত্ব চালাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কাজেই রাজা ও প্রজার মধ্যে এই সময়ে আবার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় জেম্‌স্ বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রজারা আশা করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা মেরী সিংহাসনে আরোহণ করবেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে জেম্‌সের এক পুত্র হয়। তখন প্রজাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের ভয় হল যে, জেম্‌স্ নবজাত শিশুকে ক্যাথলিক ধর্মেই দীক্ষিত করবেন। এই জন্য দেশের বড় বড় নেতারা একত্র হয়ে মেরীর স্বামী হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি উইলিয়ামকে ইংল্যাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান করেন। উইলিয়াম সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু জেম্‌স্ তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা না করেই ফরাসী দেশে পলায়ন করেন। রক্তপাত ছাড়াই এই বিপ্লব হয়েছিল বলে একে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয়।



উইলিয়াম

পার্লামেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা (Bill of Rights)— ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে উইলিয়ামের নিজস্ব কোন দাবী ছিল না, পার্লামেণ্টের প্রদত্ত অধিকারেই তিনি সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে রাজা ও পার্লামেণ্টের অধিকার সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। এতে স্থির হল যে, এখন থেকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন ঘন ঘন হবে; সদস্যরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবেন এবং পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে রাজা



পার্লামেণ্ট হাউস

কোন কর স্থাপন করতে পারবেন না। কাজেই পার্লামেণ্টের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য শাসন করা অসম্ভব হল। ফলে রাজার ক্ষমতা কমে গেল। তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের রাজারা রাজত্ব করছেন বটে কিন্তু আসলে দেশ শাসন করার অধিকার পেয়েছে পার্লামেণ্ট। এইভাবে রাজা ও পার্লামেণ্টের দ্বন্দ্বে পার্লামেণ্টের জয় হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৪৮৫—টিউডর যুগের আরম্ভ
১৬০৩—প্রথম জেম্‌সের সিংহাসন আরোহণ
১৬২৮—প্রজার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আবেদন
১৬৪০-৬০—লঙ্গ পার্লামেণ্ট
১৬৪২-৪৯—গৃহযুদ্ধ
১৬৮৮—গৌরবময় বিপ্লব
১৬৮৯—পার্লামেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা

অনুশীলনী

১। টিউডরযুগে ইংল্যাণ্ডে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? টিউডর রাজারা কেন জনপ্রিয় ছিলেন?

২। ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? কেন স্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বেধেছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

৩। প্রথম চার্লসের স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব ও লঙ্গ পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

৪। ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ কেন আরম্ভ হয়? কেন পার্লামেণ্ট পক্ষের জয় হয়েছিল? অলিভার ক্রমওয়েল সম্বন্ধে কি জান?

৫। কি কারণে গৌরবময় বিপ্লব হয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

৬। প্রজার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আবেদন (Petition of Right) এবং পার্লামেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার (Bill of Rights) বিষয়ে কি জান?

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর ভারতের দুর্দশা—মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আমরা এর আগেই জেনেছি। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সমস্ত দেশময় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাজাতি, পশ্চিম ভারতে রাজপুত ও পঞ্জাবে শিখেরা

প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দরাবাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও শুধু নামেমাত্র মুঘল সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতেন, আসলে তাঁরা তখন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের রাজত্ব কেবল দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু এখানেও তাঁরা নামেই রাজত্ব করতেন, আসল ক্ষমতা পরিচালনা করতেন তাঁদের মন্ত্রীরা। এরপরে নাদির শাহ্ ও আহ্মদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা ঃ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব— ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য যখন এভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন এদেশের রাজারা নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু করলেন আর স্থানীয় কর্মচারীরাও দেশের সাধারণ লোকেদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এই অশান্তিময় অবস্থায় ইউরোপীয় বণিকদের কাছে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের এক মহা সুযোগ উপস্থিত হল। ডুপ্লে নামে পণ্ডিচেরীর এক ফরাসী শাসনকর্তা সর্বপ্রথম ভারতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে রবার্ট ক্লাইব এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।



ডুপ্লে

ডুপ্লে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে, যুদ্ধ বিগ্রহে দেশীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন করে এদেশে ফরাসী প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। এই

সময়ে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশ ও হায়দরাবাদের সিংহাসন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। ডুপ্লে এই দুই রাজ্যের সিংহাসনপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে দুইজনের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে যোগদান করলেন। তাঁর অভিসন্ধি সফল হল; কর্ণাটক ও হায়দরাবাদে তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিরা সিংহাসন লাভ করলেন। এর ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। হায়দরাবাদের নিজাম ডুপ্লেকে এক বিশাল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ফরাসীদের মসুলিপত্তন বন্দরটি দান করেন।

এদিকে বহুকাল ধরে ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব চলছিল। দাক্ষিণাত্যে ডুপ্লের সাফল্য দেখে ইংরাজরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তখন তারাও দাক্ষিণাত্যের গৃহযুদ্ধে যোগ দিল। এই সময়ে **রবার্ট ক্লাইব** মাদ্রাজের ইংরাজ কুঠিতে কেরানীর কাজ করতেন। তিনি নিজ সৈন্য পরিচালনা করে কর্ণাটকের ফরাসী আশ্রিত নবাবকে বিতাড়িত করলেন, আর তার জায়গায় নিজেদের আশ্রিত একজন দেশীয় রাজপুত্রকে নবাব করে ঐ রাজ্যে ইংরাজদের প্রভাব বিস্তার করলেন।



ক্লাইব

এর কয়েক বৎসর পর ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতবর্ষেও তাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। তখন ফরাসীদের প্রধান সেনাপতি কাউণ্ট লালী হায়দরাবাদ থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার ফলে সেখানে ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত

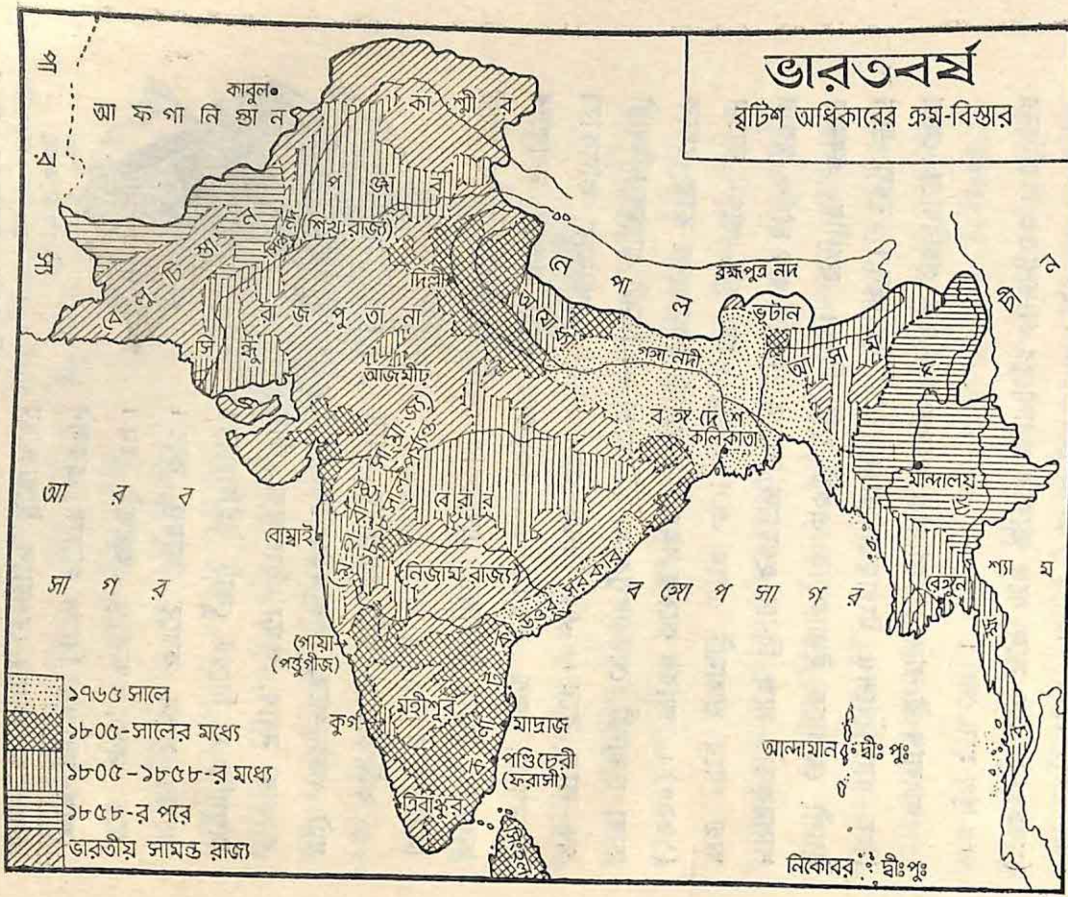
হয়। তাঞ্জোরের কাছে বন্দীবাসের যুদ্ধে লালী সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন (১৭৬১)। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তিও চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল।

বাংলায় ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপন—এদিকে গৃহবিবাদে যোগ দিয়ে বাংলাদেশেও ইংরাজরা প্রবল হয়ে উঠেছিল। মুঘল যুগে হুগলী জেলাতে ইংরাজদের একটি কুঠি ছিল। হুগলীর একজন শাসনকর্তার সঙ্গে বিবাদ হওয়াতে তাদের দলপতি **জব চার্ণক** গঙ্গার অন্য পারে সুতানটি গ্রামে এসে একটি নূতন কুঠি স্থাপন করেন (১৬৯০)। আরও কয়েক বছর পরে সম্রাট ঔরংজেবের কাছ থেকে তারা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব লাভ করে। এই তিনটি গ্রাম নিয়েই এখনকার কলিকাতা মহানগরীর জন্ম হয়। এর কিছুকাল পরে বাংলার নবাবদের অনুমতি নিয়ে ইংরাজরা এখানকার ফোর্ট উইলিয়াম নামে দুর্গটি নির্মাণ করে।



সিরাজউদ্দৌলা

কলিকাতায় কুঠি স্থাপনের প্রায় ষাট বছর পরে, **সিরাজউদ্দৌলা** যখন বাংলার নবাব, তখন ইংরাজরা তাঁর অনুমতি না নিয়েই ফোর্ট উইলিয়ামের সংস্কার সাধন করতে আরম্ভ করে। এতে নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। শেষে নবাবের বিরুদ্ধ পক্ষের একজন লোককে আশ্রয় দেওয়াতে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হয়। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করলেন। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইব


ভারতবর্ষ
বৃটিশ অধিকারের ক্রম-বিস্তার
কাবুল
আফগানিস্তান
কাশ্মীর
পঞ্জাব
বেলুচিস্থান
(শিখ রাজ্য)
দিল্লী
নেপাল
ব্রহ্মপুত্র নদ
ভুটান
রাজপুতানা
সিন্ধু
আজমীঢ়
গঙ্গা নদী
আসাম
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
বেরার
বোম্বাই
নিজাম রাজ্য
উত্তর সরকার
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
মান্দালয়
শ্যাম
রেঙ্গুন
গোয়া
(পর্তুগীজ)
মহীশূর
কুর্গ
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
(ফরাসী)
ত্রিবাঙ্কুর
আন্দামান দ্বীঃ পুঃ
নিকোবর দ্বীঃ পুঃ
১৭৬৫ সালে
১৮০৫-সালের মধ্যে
১৮০৫-১৮৫৮-র মধ্যে
১৮৫৮-র পরে
ভারতীয় সামন্ত রাজ্য

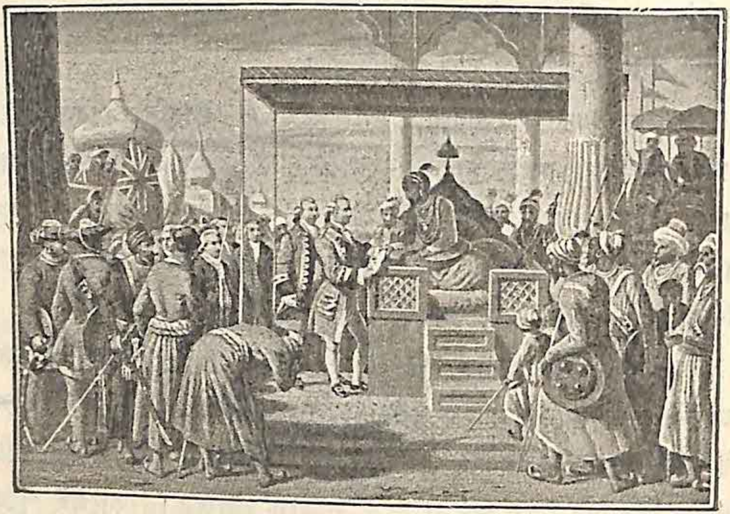
ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন এসে তার পুনরুদ্ধার করেন। তখন নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ধি স্থাপিত হল।

পলাশীর যুদ্ধ—এই সময়ে বাংলার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন। ক্লাইবও এতে যোগ দিলেন। স্থির হল যে, নবাব হয়ে মীরজাফর ইংরাজদের প্রচুর অর্থ আর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে দেবেন।

সব কিছু স্থির হবার পর ক্লাইব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তেইশ মাইল দূরে পলাশীর মাঠে দুপক্ষে যুদ্ধ হয় (১৭৫৭)। মীরজাফর তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ না করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাজেই যুদ্ধে ইংরাজদেরই জয় হল। মীরজাফর নবাব হলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্লাইবই বাংলা দেশ শাসন করতে লাগলেন।

বক্সারের যুদ্ধ—পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর ক্লাইব ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। তখন ইংরাজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী দেন। ইংরাজদের প্রভুত্ব তিনি সহ্য করতে পারলেন না বলে তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ আরম্ভ হয়। মীরকাশিম প্রকাশ্য যুদ্ধে বার বার হেরে গিয়ে অযোধ্যাতে পালিয়ে গেলেন। এবার দিল্লীর মুঘল বাদশাহ স্বয়ং, অযোধ্যার নবাব, এবং মীরকাশিম একযোগে বাংলার দিকে রওনা হলেন। বিহারের অন্তর্গত বক্সারে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হয় (১৭৬৪)। আবার ইংরাজদের জয় হল। মুঘল বাদশাহ ও অযোধ্যার নবাব ইংরাজদের শরণ নিলেন আর মীরকাশিম হলেন দেশত্যাগী।

ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ—এর কিছুকাল পরে (১৭৬৫) ইংল্যাণ্ড



শাহ আলম কর্তৃক দেওয়ানী অর্পণ

থেকে ফিরে এসে ক্লাইব মুঘল বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এতে ইংরাজরা এখানকার রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের অধিকার পেল, কিন্তু শাসন বিভাগ ও ফৌজদারী বিচারের ভার রইল নবাবের হাতে। এরপর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাংলার শাসনকর্তা হলেন তখন নবাবকে বৃত্তি দিয়ে শাসন-ক্ষমতা সমস্তই তিনি নিজের হাতে নেন। এইভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে ইংরাজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।



ওয়ারেন হেষ্টিংস্

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঃ মহীশূরের পতন—ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর তাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহীশূরের অধিপতি হায়দর আলি ও তাঁর পুত্র টিপু এবং মারাঠাগণ। হায়দর প্রথম জীবনে মহীশূরের হিন্দুরাজার সেনাপতি ছিলেন, পরে তিনি এই রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী, দূরদর্শী, সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। রাজকার্য এবং সৈন্য পরিচালনায়ও তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি অতি কঠোর ভাবে রাজ্যশাসন করতেন, কিন্তু অশেষ গুণের জন্য তিনি প্রজাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন।


হায়দর আলি

হায়দর তাঁর সৈন্যদের ফরাসীদের সাহায্যে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তারপর আশেপাশের রাজ্যগুলি জয় করে তিনি মহীশূরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। কর্ণাটক প্রদেশ জয় করতে গিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘর্ষ বাধে। একবার ইংরাজদের হাতে হায়দর নিদারুণ ভাবে পরাজিত হন; কিন্তু এতে কোন রকম নিরুৎসাহ না হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি হঠাৎ একদিন সসৈন্যে মাদ্রাজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পথে যা কিছু ছিল সব ছারখার করে দেওয়াতে ইংরাজরা ভয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এর প্রায় দশ বছর পরে মারাঠা ও হায়দরাবাদের নিজামের সঙ্গে একত্র হয়ে হায়দর আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

কিন্তু হেষ্টিংসের কূটনীতির ফলে নিজাম ও মারাঠাগণ হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করলেন। হায়দর তখন একাই যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধের মাঝখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হায়দরের মৃত্যুতে কিন্তু যুদ্ধ থামল না ; তাঁর পুত্র **টিপু** যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি একজন ইংরাজ সেনাপতিকে সসৈন্যে বন্দী করলেন। এর এক বছর পরে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়।

এর কিছুকাল পরে টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করাতে তৃতীয় বার যুদ্ধ আরম্ভ হল। তখন বড়লাট **লর্ড কর্ণওয়ালিশ** নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে টিপু সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ইংরাজরা তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ কেড়ে নিল।



টিপু সুলতান

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য টিপু কাবুলের রাজা এবং ফরাসীদের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তুরস্কের সুলতানের কাছেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। তখনকার বড়লাট **লর্ড ওয়েলেস্‌লী** বিনা যুদ্ধে তাঁকে ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা টিপু সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন চতুর্থ বার যুদ্ধ বাধল। টিপু অসীম বীরত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

টিপু পিতার মতই সাহসী ও বীর ছিলেন। তাঁর নির্মল চরিত্র, প্রবল বিদ্যানুরাগ এবং ন্যায়নিষ্ঠতার জন্য তিনি প্রজাদের প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দুমন্দির সংস্কারের জন্য অর্থদান করতেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁর আত্মবিসর্জন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

টিপুর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ইংরাজ ও নিজাম ভাগাভাগি করে নিলেন। কিছু অংশ মহীশূরের পুরোনো হিন্দুরাজবংশের এক বালককে দেওয়া হল। মহীশূর রাজ্যের পতনের কিছুকাল পরে কর্ণাটক প্রদেশও ইংরাজদের রাজ্যভুক্ত হয়।

মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন—ঔরংজেবের রাজত্বকালে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি জেগে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঔরংজেব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মহারাষ্ট্র জয় করেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় মারাঠারা কোন দিনই মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেনি। শিবাজীর পৌত্র শাহুর রাজত্বকালে পেশবাদের নেতৃত্বে তারা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। পেশবারা ছিলেন শিবাজীর বংশধরদের মন্ত্রী এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্বেসর্বা। পেশবা **বাজীরাও** মালব ও গুজরাট জয় করেন। তাঁর পুত্র **বালাজী বাজীরাও**এর সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য উত্তরে পঞ্জাব, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী, পশ্চিমে গুজরাট এবং পূর্বে উড়িষ্যাদেশ পর্যন্ত **বিস্তার** লাভ করেছিল। পঞ্জাব অধিকার করায় আহ্মদ শাহ্ আবদালীর সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ বাধে। **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** (১৭৬১) আহ্মদ শাহ্ মারাঠাদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে উত্তর ভারতে তাদের প্রাধান্য নষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পেশবা **প্রথম মাধব রাও**এর শাসনকালে আবার মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পুত্রহীন মাধব রাওএর মৃত্যুর পর তাঁর বালক ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবা পদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর খুল্লতাত **রঘুনাথ রাও** ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করলেন এবং নিজেই পেশবা পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর নারায়ণ রাওএর বিধবা পত্নীর সন্তান সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পায়। তখন **নানা ফড়নবীশ** প্রমুখ মারাঠা নেতা রঘুনাথকে পদচ্যুত করলেন; এর ফলে গৃহবিবাদ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুনাথ ইংরাজদের শরণাপন্ন হলেন। তখন **মরাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ** বাধল (১৭৭৫)। নানা ফড়নবীশ এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তি গড়ে তুলেছিলেন। ফলে ইংরাজরা যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারল না। এরপরে মারাঠাদের সঙ্গে ইংরাজদের আরও দুবার যুদ্ধ বাধে (১৮০৩-৫; ১৮১৭-১৯)। শেষ যুদ্ধে ইংরাজদের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে মারাঠাদের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। একতার অভাবই মারাঠাদের পতনের প্রধান কারণ। তা ছাড়া শিবাজীর আমলের উচ্চ আদর্শও তারা হারিয়ে ফেলেছিল।



নানা ফড়নবীশ

অধীনতামূলক মিত্রতা—ইংরাজরা শুধু বাহুবলেই ভারতে রাজ্য বিস্তার করেনি। এদেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য লর্ড ওয়েলেস্‌লী "অধীনতামূলক মিত্রতা" নামে এক অভিনব নীতির প্রবর্তন করে-ছিলেন। এর শর্ত অনুসারে ইংরাজরা ভারতীয় মিত্র রাজাদের গৃহশত্রু

ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরিবর্তে প্রত্যেক রাজাকে রাজ্যের মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য পোষণ করতে হত এবং তার সমস্ত রকম ব্যয়ভার বহন করবার জন্য রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হত। এইসব মিত্র রাজারা অন্য কোনও স্বাধীন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধি করতে পারতেন না। এইভাবে তাঁদের স্বাধীনতা লোপ পেয়ে যায়। হায়দরাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার নবাব ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা করে নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কুশাসনের অজুহাতে **লর্ড ড্যাল্‌হাউসি** অযোধ্যা প্রদেশ সম্পূর্ণ ইংরাজ-শাসনাধীন করেছিলেন।

পঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ বিজয়—ড্যাল্‌হাউসীর শাসনকালের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা পঞ্জাব-বিজয়। পঞ্জাবে তখন শিখেরা রাজত্ব করত। ঔরংজেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গুরু গোবিন্দ সিংহ ধর্মপ্রাণ শিখদের একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করেছিলেন। ক্রমে সাহসে ও বিক্রমে শিখেরা রাজপুত ও মারাঠাদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর সময় থেকে পঞ্জাবে আফগান আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। জমান শাহ্‌ নামে একজন আফগান রাজা শিখ নেতা **রণজিৎ সিংহকে** লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শিখেরা তখন কতকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। রণজিৎ এদের একতাবদ্ধ করলেন এবং আফগানদের পরাজিত করে পঞ্জাব ও কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করলেন। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরের শিখেরা কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী হল না। তিনি তাদেরও অধীনে আনতে চেষ্টা করেন—কিন্তু তারা ইংরাজদের শরণাপন্ন হল। ইংরাজদের

বল ও বিক্রমের কথা রণজিতের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি তাদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাদের কোনও আশ্রিত রাজ্য তিনি আক্রমণ করবেন না। তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পর রণজিৎ পেশোয়ার ও মূলতান জয় করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি শক্তিশালী শিখরাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁকে আমরা শিবাজী ও হায়দর আলির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তাঁদের মতই সাহস, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা থেকে রাজপদে উন্নীত হয়েছিলেন। রণজিতের চেহারা সুন্দর ছিল না। বসন্ত রোগে তাঁর এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শুধু সুনিপুণ যোদ্ধা হিসেবেই নয়, সুশাসক হিসেবেও তিনি প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন।



রণজিৎ সিংহ

রণজিতের মৃত্যুর পর ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের ছ'বার যুদ্ধ হয়। শিখ সৈন্যগণ খুব বীরত্ব এবং সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের সেনাপতিদের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তারা হেরে যায়। দ্বিতীয় বার যুদ্ধের পর লর্ড ড্যাল্‌হাউসী পঞ্জাব অধিকার করেন এবং কাশ্মীরের সিংহাসনে একজন আশ্রিত রাজাকে অধিষ্ঠিত করেন (১৮৪৯)।

পঞ্জাব জয়ের কিছু পূর্বে ইংরাজরা সিন্ধুদেশ জয় করেছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান আমীর রাজত্ব করতেন। ইংরাজরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। কিন্তু শেষে তাদের বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হয়ে লর্ড এলেনবরো এই প্রদেশটি আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। তখন সেনাপতি নেপিয়ার আমীরদের পরাজিত করে সিন্ধুদেশ জয় করেন।

ব্রহ্মদেশ বিজয়—ইংরাজরা যখন ভারতে রাজ্যস্থাপনে ব্যস্ত তখন ব্রহ্মদেশের রাজারা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয়েরা আসাম জয় করে এবং ইংরাজদের নিকট ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার ছেড়ে দেবার জন্য দাবী জানায়। এই কারণে তাদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথম বারের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করে (১৮২৬)। এই যুদ্ধের প্রায় পঁচিশ বছর পরে (১৮৫২) ইংরাজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে লর্ড ড্যাল্‌হাউসী ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পেগু প্রদেশ জোর করে কেড়ে নেন। আরও প্রায় ত্রিশ বছর পরে ফরাসীদের সঙ্গে একত্র হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ইংরাজ ও ব্রহ্মদেশীয়দের মধ্যে আবার যুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লোপ পায় (১৮৮৬)।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ—এইভাবে প্রায় একশ বছর ধরে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ করে এবং কূটনীতির সাহায্যে ইংরাজরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু বিদেশী শাসনে ভারতবাসীদের মনে শান্তি ছিল না। ইংরাজরা সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার, এবং নানা রকম সামাজিক সংস্কার আরম্ভ করেছিল। এতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন। এদিকে

লর্ড ড্যাল্‌হাউসী অযোধ্যা, নাগপুর, সাতারা, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যগুলি অন্যায়ভাবে ইংরাজদের অধীনে আনেন। কাজেই এইসব রাজ্যের রাজাদের ও প্রজাদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ইংরাজদের অধীনস্থ ভারতীয় সিপাহীরাও নানা কারণে বিরক্ত ছিল। শেষে তারা যখন শুনতে পেল, গরু এবং শূকরের চর্বি মেশানো বন্দুকের একরকম নূতন টোটা তাদের দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হবে, তখন তারা ধর্মনাশের ভয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

বিদ্রোহ প্রথম দেখা দিয়েছিল বাংলা দেশে—সেখান থেকে তা বিহার, অযোধ্যা, দিল্লী ও মধ্যভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা ইংরাজ দেখলেই তাদের হত্যা করত আর তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিত। মীরাট থেকে একদল বিদ্রোহী দিল্লী গিয়ে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন **নানা সাহেব,** তিনি বহু ইংরাজকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেন। **ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ** নানা সাহেবের সেনাপতি **তাঁতীয়া টোপী**র সঙ্গে মিলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন।

বিদ্রোহীরা ভারতের ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। কিন্তু শিখ ও গুর্খা সৈন্য এবং কয়েকজন ভারতীয় রাজার সাহায্যে ইংরাজরা এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হল। এতদিন ধরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ বণিকেরাই ভারতবর্ষে রাজত্ব করত। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। তখন থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৭৪৪-৬১—ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ

১৭৬৪—বক্সারের যুদ্ধ

১৭৬৫—দেওয়ানী লাভ

১৭৯৯—মহীশূরের পতন

১৮১৯—মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন

১৮৪৩—সিন্ধু বিজয়

১৮৪৯—পঞ্জাব অধিকার

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ

অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ বিদেশী শক্তি প্রথম সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা করেন ? ডুপ্লের কথা কি জান ?

২। ফরাসীদের সঙ্গে কেন ইংরাজদের যুদ্ধ হয়েছিল ?

৩। বাংলাদেশে ইংরাজরা কি ভাবে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল ?

৪। হায়দর ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাজদের কেন যুদ্ধ হয়েছিল ? এই যুদ্ধের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। কি ভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ?

৬। অধীনতামূলক মিত্রতা বলতে কি বোঝা যায় ? অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করেছিলেন এইরকম দুজন শাসকের নাম বল।

৭। রণজিৎ সিংহের কথা যা জান বল।

৮। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের কারণ কি ? সিপাহী বিদ্রোহের কথা সংক্ষেপে বল।

৯। এদের সম্বন্ধে কি জান বলঃ—নাদির শাহ্, আহমদ শাহ্ আবদালী, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, লর্ড ক্লাইব, জব চার্ণক, মীরজাফর, লর্ড ওয়েলেস্‌লী, মাধব রাও পেশোবা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকায় বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

আমেরিকার দেশগুলি কি ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল এর আগে সে বিষয়ে আমরা বলেছি। ইউরোপীয়রা প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। ক্রমে সোনারূপা, পশুলোম, খনিজ ও কৃষি সম্পদের খোঁজে এসে তারা অনেকে এখানেই চাষ-আবাদ করবার জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এইভাবে আমেরিকায় কতকগুলি উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইংরাজদের উপনিবেশ স্থাপন—স্টুয়ার্ট যুগে যখন রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তখন বহু ইংরাজ দেশ ছেড়ে আমেরিকাতে যায়। আমেরিকা তখন জনবিরল ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। নূতন আগন্তুকেরা বহু চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দিয়ে ছোট ছোট সভ্য সমাজ গড়ে তোলে। ক্রমে এরা উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে তেরটি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকাই তখন থেকে হল এদের মাতৃভূমি।

ইংল্যাণ্ড থেকে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হল না। সেখানকার রাজাকে তারা রাজা বলে মেনে নিয়েছিল। প্রত্যেক উপনিবেশের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে একজন করে শাসনকর্তা আসতেন। তাঁরা ঔপনিবেশিক-দের সঙ্গে মিলেমিশে শাসনকার্য চালাতেন। প্রত্যেক উপনিবেশে


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার
প্রথম তেরটি উপনিবেশ
কা
না
ডা
ওয়াশিংটন ১৮৮৯
ওরিগন ১৮৫৯
ক্যালিফোর্ণিয়া ১৮৫০
আইডাহো ১৮৯০
নেভাদা ১৮৬৪
ম ন্ট্যা না ১৮৮৯
ওয়াইওমিং ১৮৯০
ইউটা ১৮৯৬
আরিজোনা ১৯১২
উত্তর ডাকোটা ১৮৮৯
দক্ষিণ ডাকোটা ১৮৮৯
নেব্রাস্কা ১৮৬৭
কলোরাডো ১৮৭৬
কানসাস ১৮৬১
নিউ মেক্সিকো ১৯১২
ওকলাহোমা ১৯০৭
টেক্সাস ১৮৪৫
আয়োয়া ১৮৪৬
মিজুরী ১৮২১
ইলিনয় ১৮১৮
ইণ্ডিয়ানা ১৮১৬
ওহায়ো ১৮০৩
কেনটাকী ১৭৯২
টেনেসী ১৭৯৬
আলাবামা ১৮১৯
ফ্লোরিডা ১৮৪৫
জর্জিয়া
নিউ ইয়র্ক
পেনসিলভানিয়া
ভার্জিনিয়া
উঃ ক্যারোলাইনা
দঃ ক্যারোলাইনা
মেইন
বোস্টন
ইয়র্ক টাউন
মে ক্সি কো
১, ভারমন্ট ১৭৯১
২, নিউ হ্যাম্পশ্যায়ার
৩, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌
৪, রোড আয়ল্যাণ্ড
৫, কনেকটিকাট
৬, নিউ জার্সি
৭, ডেলাওয়ার
৮, মেরীল্যাণ্ড

সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত ছোট ছোট পার্লামেণ্টের সাহায্যে আইন-কানুন তৈরী হত। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে উপনিবেশগুলিকে কয়কটি বিশেষ আইন মেনে চলত হত; যেমন, ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর কেনো দেশ থেকে এরা কোনো জিনিস আমদানি করতে পারত না, রপ্তানিও করতে পারত না। কিন্তু ঔপনিবেশিকরা এ নিয়ম সব সময়ে মেনে চলত না, এবং সরকারী কর্মচারীরাও তা কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করত না। কাজেই ইংল্যাণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে মোটামুটি সদ্ভাব ছিল।

ইংল্যাণ্ডের সহিত বিরোধ—এই ভাবে প্রায় দেড়শ বছর কেটে যাবার পর উপনিবেশগুলির মধ্যে দারুণ অশান্তি দেখা দিল। এতদিন ধরে তারা ইংরাজদের কর্তৃত্ব সহ্য করে আসছিল একটি বিশেষ কারণে। আমেরিকার উত্তরে কানাডা ছিল তখন ফরাসীদের হাতে। তাই তারা ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী একটি যুদ্ধ হয়। তার ঢেউ একদিকে ভারতবর্ষে আর অন্যদিকে আমেরিকাতেও পোঁছেছিল। ইংরাজদের কাছে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়; সেই একই সময়ে ইংরাজরা যুদ্ধ করে কানাডা রাজ্যও কেড়ে নিল। এরপরে আমেরিকাবাসীদের মনে ফরাসী-ভীতি দূর হয়ে গেল। তারা আর ইংরাজদের অধীন থাকতে চাইল না। ইংল্যাণ্ডের শাসনকর্তারাই তাদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ করে দিলেন। ফরাসীদের হাত থেকে ঔপনিবেশিকদের রক্ষা করবার জন্য যে সৈন্য রাখতে হত তাতে ইংল্যাণ্ডের অনেক টাকা খরচ হত। তাই ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের একদল লোক মনে করলেন যে ঔপনিবেশিকদেরই তাদের দেশরক্ষার ব্যয়ভার বহন করা উচিত।

কাজেই তখন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের আইনগুলি খুব কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করা হল এবং আরও কতকগুলি ছোটখাট করভার তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এতে ঔপনিবেশিকরা ইংরাজদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

স্ট্যাম্প এ্যাক্ট—এই সময়ে লর্ড গ্রেনভিল ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ট্যাম্প এ্যাক্ট (Stamp Act) নামে একটি আইন জারি করলেন। এতে স্থির হল যে, আমেরিকাতে কোবালা, খত প্রভৃতি সমস্ত দলিল নির্ধারিত মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজের উপর লিখতে হবে; আর এথেকে যে টাকা আদায় হবে তা সেখানকার সরকারী খরচ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হবে। আমেরিকা-বাসীরা এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হল। তারা বলল যে, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই, কাজেই সে পার্লামেণ্ট তাদের উপর কোনও কর বসাতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভা করে নূতন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হল এবং দু' একটা ছোটখাট সঙ্ঘর্ষও হল। বোস্টন শহরের স্ট্যাম্প-বিক্রেতাদের 'খড়ের মূর্তি' তৈরী করে আগুনে পোড়ান হল।

ইংল্যাণ্ডের নেতাদের মতামত—ইতিমধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ইংল্যাণ্ডে দুটি দল গড়ে উঠেছিল। একদলে ছিলেন আমেরিকার পক্ষ সমর্থনকারী বার্ক, পিট প্রভৃতি তখনকার দিনের কয়েকজন বিখ্যাত নেতা; অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ এবং তাঁর মন্ত্রী গ্রেনভিল। রাজা ও মন্ত্রী কারো কথা গ্রাহ্য করলেন না। কাজেই আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চলল। গ্রেনভিলের পর প্রধান মন্ত্রী হলেন রকিংহাম। বার্কের উপদেশ শুনে তিনি স্ট্যাম্প আইন তুলে দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমেরিকাবাসীদের জানিয়ে দিলেন

যে, তাদের জন্য আইন তৈরী করবার এবং কর বসাবার পূর্ণ অধিকার ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের আছে।

"বোস্টন টি পার্টি"—এই ঘোষণার এক বছরের মধ্যে টাউনশেণ্ড নামে একজন মন্ত্রী আমেরিকাতে আমদানি-করা কাঁচ, কাগজ, চা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের ওপর কর বসান। এতে আমেরিকাবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে এসমস্ত জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দিল। তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ একমাত্র চায়ের উপর ছাড়া আর সবগুলি কর উঠিয় নিলেন। কিন্তু এতে কোন ফল হল না। আন্দোলন সমানে চলতে লাগল। বোস্টন শহরের কয়েকজন লোক একদিন রাতের অন্ধকারে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশ ধরে একখানা চা-বোঝাই জাহাজে উঠে সমস্ত চা সমুদ্রে ফেলে দিল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ এই খবর পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিয়ে ম্যাসাচুসেট্‌স্ উপনিবেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারই বাতিল করে দিলেন। সরকারী হুকুম যাতে কেউ অমান্য না করতে পারে সেজন্য ইংল্যাণ্ড থেকে যুদ্ধজাহাজ এবং সৈন্য-সামন্ত পাঠান হল। সুতরাং উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

আমেরিকার বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ আরম্ভ—সকলের আগে ম্যাসা-চুসেট্‌স্এর অধিবাসীরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। জর্জিয়া ছাড়া অন্য সব উপনিবেশ তাদের সমর্থন করল। বর্তমান অবস্থায় কি করা যেতে পারে তা স্থির করবার জন্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে **কংগ্রেস** নামে এক জাতীয় মহাসভা গঠিত হল।

এর পরের বছর লেক্‌সিংটন নামে এক স্থানে বৃটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের মধ্যে একটি ছোটখাট সঙ্ঘর্ষ হয়। সেই থেকেই দু দলের যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথম প্রথম ইংল্যাণ্ডের সেনাপতিরা জয়লাভ

করতে থাকেন। তার কারণ তাঁদের সৈন্যরা ছিল সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত ; এদিকে আমেরিকাবাসীরা না ছিল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, না ছিল তাদের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র।

জর্জ ওয়াশিংটন—এই সময়ে জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন আমেরিকাবাসীদের নেতা এবং সেনাপতি। সাধুতা, সাহস ও কর্মদক্ষতার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অসামান্য প্রতিভার বলে আমেরিকার পরিশ্রমী ও সাহসী কৃষকদের নিয়ে তিনি এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন। এরা বার বার পরাজিত হয়েও স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে এরা ইংরাজ সৈন্যদের ভীষণ ভাবে হারিয়ে দিল। তাদের বীরত্ব-কাহিনী সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ইংল্যাণ্ডের চিরশত্রু ফ্রান্স এবং স্পেন তখন আমেরিকার পক্ষে যোগদান করল। আমেরিকাবাসীরা এতে উৎসাহিত হয়ে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রতি বছর এই দিনটি তারা স্বাধীনতা দিবস বলে আজও পালন করে।



ওয়াশিংটন

লর্ড কর্ণওয়ালিশের আত্মসমর্পণ—ক্রমে যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ, যিনি পরে আমাদের দেশের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন, তিনি সসৈন্যে আমেরিকাবাসীদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। এইভাবে সাত বছর যুদ্ধের পর ইংরাজরা আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হল।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র—এরপরে চার বছর ধরে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে উপনিবেশগুলির নিজেদের মধ্যে নানা রকম গোলমাল চলে। শেষে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সকলে মিলে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করল। এরা রাজপদ একেবারে তুলে দিল ; ঠিক হল যে, চার বছর অন্তর একজন রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) নির্বাচিত হবেন এবং জনগণের প্রতিনিধিসভার সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করবেন। আজ পর্যন্তও যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি হন।

যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হবার পর আমেরিকা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসংখ্যা এখন পঞ্চাশ। আটলাণ্টিকের তীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য আমেরিকার সমগ্র ভূভাগই এই বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত। এখন ধনে, মানে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিগুলির মধ্যে নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৭৫৯-৬০—ইংল্যাণ্ডের কানাডা বিজয়

১৭৬৫—স্ট্যাম্প এ্যাক্ট ; আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধের সূচনা

১৭৭৫—যুদ্ধ আরম্ভ

১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা

১৭৮৩—সন্ধি—ইংল্যাণ্ড কর্তৃক আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার

১৭৮৯—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি

অনুশীলনী

স্বাধীনতার পূর্বে ইংল্যাণ্ডের সহিত আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশগুলির কি রকম সম্পর্ক ছিল? কেন এই উপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিরোধ বাধে? যুদ্ধের সময়ে আমেরিকাবাসীদের নেতা কে ছিলেন? স্বাধীনতা লাভের পর আমেরিকায় কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

সপ্তম অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব

বিপ্লবের পূর্বে ফরাসীদেশের অবস্থা : রাজা—বহুকাল থেকে ফরাসীদেশে বুঁর্বো বংশের রাজারা দেশ শাসন করতেন। ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের মত তাঁরাও নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত প্রজাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। বুঁর্বো রাজারা একদিকে যেমন স্বেচ্ছাচারী অপরদিকে তেমনি বিলাসপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা এবং বড় বড় রাজপ্রাসাদগুলি ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজাদের আদর্শ ছিল।

অভিজাত ও যাজক শ্রেণী—ফরাসী সমাজে রাজার পরেই জমিদার ও যাজক শ্রেণীর লোকেরা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ছিলেন। তাঁরা অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। দেশের বেশীর ভাগ জমিজমা ছিল তাঁদের অধিকারে। রাজসভা এবং সৈন্যবিভাগের বড় বড় চাকুরিতেও তাঁদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু বিস্তৃত জমিজমা ও ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও তাঁরা

রাজাকে কোন রকম খাজনা দিতেন না। অথচ দেশ-শাসনের আইন-কানুনগুলি তাঁদের স্বার্থ বজায় রেখেই তৈরী করা হত। এই কারণে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত অসীম ক্ষমতাশালী ফরাসী রাজতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোক—ফরাসী রাজসভার যতরকম অপচয় ও বিলাস-ব্যসনের খরচ জোগানোর গুরুভার সবই গিয়ে পড়েছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত, কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকেদের উপর। মধ্যবিত্তদের অবস্থা



অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের সাজ-সজ্জা

মোটামুটি সচ্ছল ছিল এবং বিদ্যাবুদ্ধিতেও এরা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু শাসন ব্যাপারে এদের বিশেষ কোন অধিকার না থাকাতে এরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পের উন্নতি না হওয়ায় শ্রমিক ও শিল্পীদের মধ্যে অনেকে বেকার ছিল। এইজন্য ফ্রান্সের শহরে শহরে তখন বহু ক্ষুধার্ত গরীব বাস করত। সব চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের। কৃষককে তিন দফা কর দিতে হত—প্রথমতঃ তার জমিদারকে, দ্বিতীয়তঃ তার এলাকার ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তাকে, তৃতীয়তঃ রাজাকে। এছাড়াও

তাকে নানা রকমের বেগার খাটতে হত। এই সমস্ত দরিদ্র কৃষকের এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের করাতের গুঁড়ো মেশান ঘাসের রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হত। সারা ফ্রান্সের প্রায় আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সওয়া তু' কোটি লোক ছিল চাষী। এদের উপরই রাজা, জমিদার ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি নানা রকম অত্যাচার চালাতেন। কাজেই দেশের নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা একটা বড় রকমের বিপ্লবের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

ভল্‌তেয়ার ও রুশো—ফরাসী দেশের যখন এই রকম অবস্থা তখন কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য নূতন ভাবধারা এনে দিলেন। এঁদের লেখাতে ফুটে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং সেই সঙ্গে মুক্তির দাবী। ভল্‌তেয়ার তাঁর অমর লেখনীর সাহায্যে স্বৈরাচারী রাজশক্তি ও যাজকদের আক্রমণ করলেন। তাঁর লেখা পড়ে দেশের জনসাধারণের মন থেকে রাজা এবং পুরোহিতদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘুচে গেল। রুশো নামে আর একজন প্রতিভাবান লেখক দেশের সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকেই উল্টে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, প্রজাসাধারণের সমবেত ইচ্ছা এবং সমর্থনই হচ্ছে রাজতন্ত্রের ভিত্তি। কাউকে রাজপদে নিয়োগ করা অথবা বরখাস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রজাসাধারণের আছে। "সামাজিক চুক্তি" (Social Contract) নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের দাবী প্রতিষ্ঠিত করলেন। রুশোর লেখা পড়ে সমস্ত দেশময় অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের ভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল ফরাসী সৈন্য যোগ দিয়েছিল তারাও দেশে ফিরে স্বাধীনতা লাভের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলল।

সাধারণ রাষ্ট্রসভার (States General) আহ্বান (১৭৮৯)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে বুঁর্বো বংশীয় রাজা ষোড়শ লুই রাজত্ব করতেন। তিনি খারাপ লোক ছিলেন না, তবে অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তাঁর পক্ষে দেশের অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। রাজসভার উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের খরচ জোগাতে গিয়ে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ফ্রান্সে দারুণ অর্থকষ্ট দেখা দিয়েছিল। অর্থসংগ্রহের তখন একমাত্র উপায় ছিল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কর ধার্য করা। পর পর দুইজন মন্ত্রী সেই চেষ্টাই করলেন; কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য তাঁরা সফলকাম হতে পারলেন না। রাজা তখন দেশের সাধারণ রাষ্ট্রসভা ডাকতে বাধ্য হলেন (১৭৮৯)। ইংল্যাণ্ডে যেমন পার্লামেন্ট, ফরাসীদেশেও তেমনি এই সাধারণ রাষ্ট্রসভা। কিন্তু এর আগে প্রায় দু'শো বছরের মধ্যে এই সভা একবারও ডাকা হয়নি। এতদিন পরে সভার অধিবেশন ডাকাতে জনসাধারণের পক্ষে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করবার সুযোগ এল।



ষোড়শ লুই

বিপ্লবের সূচনা—ফরাসী দেশের এই সাধারণ রাষ্ট্রসভা ছিল দেশের সমস্ত অভিজাত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই তিনটি শ্রেণী আলাদা আলাদা ভাবে মিলিত হয়ে নিজেদের দেয় কর মঞ্জুর করত। প্যারিসের অনতিদূরে

ভার্সাই শহরের রাজপ্রাসাদের নিকটে সাধারণ রাষ্ট্রসভার অধিবেশন বসল। অধিবেশনের প্রথমেই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দাবী করলেন যে, অভিজাত, ধর্মযাজক এবং সাধারণ প্রতিনিধিরা সকলেই একত্রে অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের আলাদা ভোট থাকবে। কিন্তু অভিজাত ও ধর্মযাজক প্রতিনিধিরা এতে রাজী হলেন না। তখন রাজার আদেশে সভাগৃহ বন্ধ করে দেওয়া হল। **মীরাবো** নামে একজন অভিজাত প্রতিনিধি জনসাধারণের পক্ষ হয়ে রাজার এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিগণ নিকটবর্তী এক টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে তাঁরা নিরস্ত হবেন না। রাজাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। এইভাবে জনসাধারণের প্রথম জয় সূচিত হল। তারা সাধারণ রাষ্ট্রসভাকে **জাতীয় সভা** (National Assembly) বলে ঘোষণা করল।

ব্যাস্তিল দুর্গের পতন—জনসাধারণের এই ক্ষমতালাভ লুই সহ্য করতে পারলেন না। জাতীয় সভা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। এই ঘটনায় প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা বিদ্রোহী হয়ে ব্যাস্তিল (Bastille) দুর্গ আক্রমণ করল। এই দুর্গটি ছিল ফ্রান্সের লোকেদের কাছে রাজশক্তির প্রতীক। রাজার অপ্রীতিভাজন লোকদের বিনা বিচারে সেখানে বন্দী করে রাখা হত। যারা একবার এখানে প্রবেশ করত তারা কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসত না। বিদ্রোহীরা এই দুর্গটিকে অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলল এবং বন্দীদের মুক্তি দিল। ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের দিনটি আজও ফরাসীরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে। এর পর বিদ্রোহীরা প্যারিসে এক

সাধারণ রাষ্ট্রসভার (States General) আহ্বান (১৭৮৯)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে বুঁর্বো বংশীয় রাজা ষোড়শ লুই রাজত্ব করতেন। তিনি খারাপ লোক ছিলেন না, তবে অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন। তাঁর পক্ষে দেশের অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। রাজসভার উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের খরচ জোগাতে গিয়ে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তার উপর ইংরাজদের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ফ্রান্সে দারুণ অর্থকষ্ট দেখা দিয়েছিল। অর্থসংগ্রহের তখন একমাত্র উপায় ছিল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর কর ধার্য করা। পর পর দুইজন মন্ত্রী সেই চেষ্টাই করলেন; কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য তাঁরা সফলকাম হতে পারলেন না। রাজা তখন দেশের সাধারণ রাষ্ট্রসভা ডাকতে বাধ্য হলেন (১৭৮৯)। ইংল্যাণ্ডে যেমন পার্লামেন্ট, ফরাসীদেশেও তেমনি এই সাধারণ রাষ্ট্রসভা। কিন্তু এর আগে প্রায় দু'শো বছরের মধ্যে এই সভা একবারও ডাকা হয়নি। এতদিন পরে সভার অধিবেশন ডাকাতে জনসাধারণের পক্ষে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করবার সুযোগ এল।



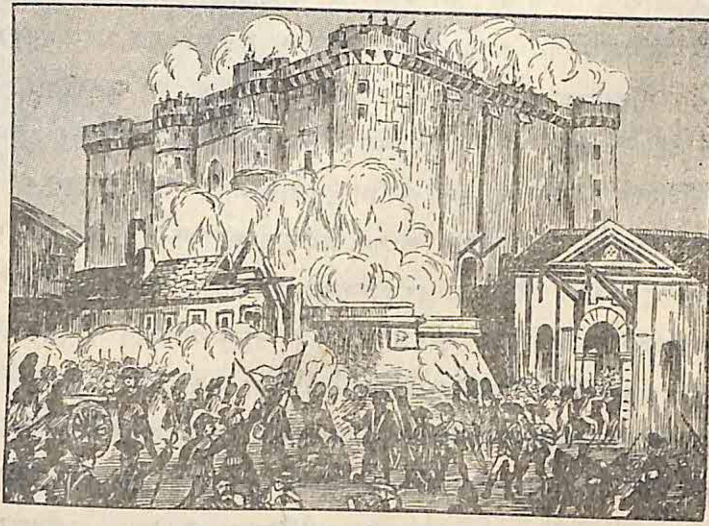
ষোড়শ লুই

বিপ্লবের সূচনা—ফরাসী দেশের এই সাধারণ রাষ্ট্রসভা ছিল দেশের সমস্ত অভিজাত শ্রেণী, যাজক শ্রেণী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই তিনটি শ্রেণী আলাদা আলাদা ভাবে মিলিত হয়ে নিজেদের দেয় কর মঞ্জুর করত। প্যারিসের অনতিদূরে

ভার্সাই শহরের রাজপ্রাসাদের নিকটে সাধারণ রাষ্ট্রসভার অধিবেশন বসল। অধিবেশনের প্রথমেই জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দাবী করলেন যে, অভিজাত, ধর্মযাজক এবং সাধারণ প্রতিনিধিরা সকলেই একত্রে অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের আলাদা ভোট থাকবে। কিন্তু অভিজাত ও ধর্মযাজক প্রতিনিধিরা এতে রাজী হলেন না। তখন রাজার আদেশে সভাগৃহ বন্ধ করে দেওয়া হল। **মীরাবো** নামে একজন অভিজাত প্রতিনিধি জনসাধারণের পক্ষ হয়ে রাজার এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিগণ নিকটবর্তী এক টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেন যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে তাঁরা নিরস্ত হবেন না। রাজাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। এইভাবে জনসাধারণের প্রথম জয় সূচিত হল। তারা সাধারণ রাষ্ট্রসভাকে **জাতীয় সভা** (National Assembly) বলে ঘোষণা করল।

ব্যাস্তিল দুর্গের পতন—জনসাধারণের এই ক্ষমতালাভ লুই সহ্য করতে পারলেন না। জাতীয় সভা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। এই ঘটনায় প্যারিসের সাধারণ নাগরিকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা বিদ্রোহী হয়ে ব্যাস্তিল (Bastille) দুর্গ আক্রমণ করল। এই দুর্গটি ছিল ফ্রান্সের লোকেদের কাছে রাজশক্তির প্রতীক। রাজার অপ্রীতিভাজন লোকদের বিনা বিচারে সেখানে বন্দী করে রাখা হত। যারা একবার এখানে প্রবেশ করত তারা কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসত না। বিদ্রোহীরা এই দুর্গটিকে অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলল এবং বন্দীদের মুক্তি দিল। ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের দিনটি আজও ফরাসীরা জাতীয় দিবস হিসাবে পালন করে। এর পর বিদ্রোহীরা প্যারিসে এক

নূতন পৌরশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলল এবং তার নাম দিল "কমিউন" একটি জাতীয় রক্ষী দল গঠন করে তারা লাফায়েৎ নামে একজন দেশ-প্রেমিক নাগরিককে এর অধিনায়ক করে দিল। তখন বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল।



ব্যাস্তিল দুর্গের পতন

ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের সংবাদ দেশে দেশে নগরে নগরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্যারিসের মত ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গায়ও জাতীয় রক্ষী দল গড়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াল। নিজ নিজ এলাকায় জড় হয়ে তারা জমিদারদের প্রাসাদ ও দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলল, তাঁদের সম্পত্তির দলিলপত্রও সব পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। এই সময়ে জাতীয় সভার এক অধিবেশনে অভিজাত সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় জমির উপর নিজেদের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রাজা ও জাতীয় সভার সদস্যদের প্যারিসে আগমন : নূতন শাসন-ব্যবস্থা—ইতিমধ্যে রাজধানী প্যারিসের অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়। সেখানে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সামান্য এক টুকরো রুটির জন্য ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায়। তখন একদল ক্ষুধার্ত নারীবাহিনী কামান বন্দুক সঙ্গে নিয়ে ভার্সাইতে এসে উপস্থিত হল এবং জোর করে রাজাকে সপরিবারে প্যারিসে আসতে বাধ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সভার সদস্যরাও প্যারিসে এলেন। তাঁরা সমস্ত মানব জাতির মৌলিক অধিকার সম্পর্কে একটি ঘোষণা-পত্র প্রস্তুত করেন। এতে মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয় পরিষদ এক নূতন শাসনতন্ত্রও রচনা করল। এতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হল। রাজার আর স্বেচ্ছাচার রাজ্যশাসনের ক্ষমতা রইল না। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত সম্পত্তিও এই সময়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

রাজার প্যারিস থেকে পলায়নের চেষ্টা—ষোড়শ লুইর কিন্তু নূতন শাসন-ব্যবস্থা পছন্দ হল না। বিদেশীদের সাহায্যে তাঁর পূর্বের ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য তিনি সপরিবারে প্যারিস ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সীমান্তে এসে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে আবার জোর করে প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল।

জ্যাকোবিন দল—ফ্রান্সে এই সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। একদল ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। আর একদল রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এজন্য তারা কোনও রকম বল প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল না। তৃতীয় দলের লোকদের বলা হত **জ্যাকোবিন**। এরাও প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস করত এবং তার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সকল রকম বল প্রয়োগ

করতে প্রস্তুত ছিল। রাজার প্যারিস থেকে পলায়নের চেষ্টার পর থেকে জ্যাকোবিনদের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিপ্লবীদের সঙ্গে ইউরোপের রাজাদের যুদ্ধ ও রাজতন্ত্রের পতন—ফ্রান্সে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখে ইউরোপের বড় বড় রাজারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লব শুরু হবার পর ফ্রান্সের অভিজাত পরিবারের বহু লোক ইউরোপের অন্যান্য রাজসভায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিদেশী রাজাদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। রাজপক্ষের যে সব লোক ফ্রান্সে ছিল তাঁরাও গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ফ্রান্সের রাণী মারী আঁতোআনেৎ ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভগ্নী। ১৭৯১ সালের আগষ্ট মাসে অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গে একত্র হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা লুইকে বিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্ত করে ফ্রান্সের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। ফলে এঁদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ বেধে গেল। প্রথমে বিপ্লবীরাই হেরে যায়। তারা মনে করল যে, নিশ্চয়ই বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে লুইর কোন যোগাযোগ আছে। তাই প্যারিসের উত্তেজিত জনতা রাজপ্রাসাদ দখল করে রাজা ও রাণীকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তখন দেশের শাসনতন্ত্র কি রকম হবে তা স্থির করবার জন্য একটি নূতন প্রতিনিধি সভা (Convention) আহ্বান করা হয়। এঁরা রাজাকে পদচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। এইভাবে ফরাসী দেশে তখনকার মত রাজতন্ত্রের অবসান হল।

ফ্রান্সের সেনাবিভাগে সে সময়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এইজন্য প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সেনাপতিরা মনে করেছিলেন যে, তাঁরা অনায়াসে ফ্রান্সে প্রবেশ করে লুইকে পুনরায় সিংহাসনে বসাতে পারবেন। কিন্তু বিদেশীদের আক্রমণের ফলে ফরাসীদের মধ্যে এক

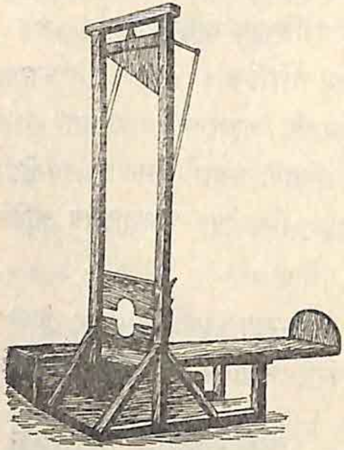
নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ রক্ষার জন্য ফ্রান্সের নানা জায়গা থেকে তরুণেরা এসে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। ফ্রান্সের আকাশে বাতাসে তখন এক অভিনব সঙ্গীত শোনা যেত। এই বিখ্যাত সঙ্গীতটি **'মার্সেলস্'** নামে পরিচিত। এর তালে তালে ফরাসী সৈন্যবাহিনী অমিতবিক্রমে বিদেশী শত্রুদের আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিত। **ভালমির যুদ্ধে** বিপ্লবী ফরাসী সৈন্যরা অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের অপরাজেয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সন্ত্রাস-রাজত্ব—এদিকে বিদেশী আক্রমণের ভীতি এবং রাজ-পক্ষীয়দের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনায় ক্রমেই দেশের শাসন পরিচালনার ভার চরমপন্থী-বিপ্লবী জ্যাকোবিনদের হাতে চলে যায়। এদের নেতাদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ছিলেন **রোব্জ্পিয়ার**। সমস্ত বিপদ দূর করবার জন্য তিনি এক সন্ত্রাস-রাজত্বের (Reign of Terror) প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ড হল। গিলোটিন নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে


রোব্জ্পিয়ার

তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। কিছুদিন পরে রাণীরও এইভাবে শিরশ্ছেদ হল। এরপরে ফ্রান্সে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। জ্যাকোবিনরা নির্বিচারে বা বিচারের প্রহসন করে আরও বহু লোককে গিলোটিনের সাহায্যে হত্যা করে। যাকেই রাজা বা অভিজাতদের সমর্থক বলে

সন্দেহ করা হত তাকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হত। এই সময়ে বিপ্লবীদের বিচারে দু হাজারেরও বেশী লোককে গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।



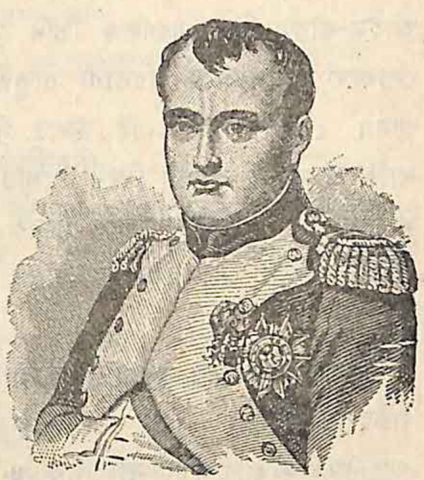
গিলোটিন

জ্যাকোবিনরা কিন্তু অতি দক্ষতার সঙ্গে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। লুইর প্রাণদণ্ড হবার পর ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধে। এর পর কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সকে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। অদম্য উৎসাহ নিয়ে ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইট্জারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশের বহু রণাঙ্গনে জয়লাভ করে এবং প্রায় সর্বত্র ফরাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

দেশের বাইরে ও ভিতরে সাফল্য অর্জন করে জ্যাকোবিনরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে এদের নিজেদের মধ্যেই কলহ এবং দলাদলি শুরু হয়ে যায়। তখন রোব্‌জ্‌পিয়ারের যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁরাও একে একে প্রাণ হারালেন। শেষে রোব্‌জ্‌পিয়ার নিজেও গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। সন্ত্রাস-রাজত্বেরও অবসান হল।

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান—রোব্‌জ্‌পিয়ারের পতনের পর দেশ-শাসনের ভার পড়ে পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এক নির্দেশক সভার (Directory) উপর। কিন্তু এঁরা দেশের মধ্যে সুশাসন ফিরিয়ে

আনতে পারলেন না। বিদেশীদের সঙ্গে তখনও যে যুদ্ধ চলছিল তাতে ফরাসীরা হেরে গেল। এই সুযোগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামে একজন অসীম প্রতিভাশালী সেনানায়ক, দেশশাসনের সমস্ত ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত করেন। এর পূর্বেই তিনি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সেনাদের সহায়তায় তিনি দেশের পর দেশ জয় করে ফরাসীদের মনে বিজয়-গৌরবের উদ্দীপনা এনেছিলেন। শাসন-ক্ষমতা লাভ করবার কয়েক বছর পর তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তিনি প্রায় সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজত্বের শেষের দিকে স্পেনে, জার্মানীতে এবং রাশিয়ায় তাঁর পরাজয় হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন তাঁকে চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত করলেন। এরপরে ফ্রান্সের সিংহাসনে বুঁর্বো বংশের আর একজন রাজাকে বসান হয়েছিল।



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের সংস্কার—গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর প্রতি নেপোলিয়নের কোন আস্থা ছিল না। বুঁর্বোবংশীয় রাজাদের মত তিনিও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্রান্সে যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল, নেপোলিয়ন সেগুলি আইন

করে স্থায়ী করেছিলেন। এর ফলে ফ্রান্সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপিত হয়েছিল। রাজপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে যে সব আইন-কানুন ছিল সেগুলিও তিনি তুলে দেন এবং সকল শ্রেণীর লোককে গুণানুসারে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করবার অধিকার দেন। নেপোলিয়নের এই উদার নীতির জন্য ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমৃদ্ধি আবার ফিরে এসেছিল। তিনি দেশের পথঘাট সংস্কার, শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি অনেক জনহিতকর কার্য করেছিলেন। পরবর্তী কালে নেপোলিয়নের রচিত আইনগুলি বহু দেশে গৃহীত হয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব—ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে শুধু ফ্রান্সেই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার লোপ পেয়েছিল তাই নয়। যে সব কারণে ফরাসীদেশে এই বিপ্লব ঘটেছিল সেই সব কারণ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বর্তমান ছিল। যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবীরা তাদের বাণী এই সব দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেখানকার উদারনৈতিক দলগুলি এবং সাধারণ লোক এই বিপ্লবের বাণী সাদরে গ্রহণ করেছিল। এই সব দেশগুলির শাসনতন্ত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ক্রমে গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক নূতন ইউরোপের জন্ম হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৭৮৯, মে—ফ্রান্সের সাধারণ রাষ্ট্রসভার অধিবেশন আহ্বান
,, জুলাই—ব্যাস্তিল দুর্গের পতন
১৭৯২—ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের রাজাদের যুদ্ধ আরম্ভ

১৭৯৩—ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদ ও সন্ত্রাস-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা

১৭৯৪—রোবৃজ্‌পিয়ারের পতন ও সন্ত্রাস-রাজত্বের অবসান

১৭৯৯—নেপোলিয়নের ক্ষমতা লাভ

১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধ; নেপোলিয়নের পতন

অনুশীলনী

১। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত লোক ও জনসাধারণের কিরূপ অবস্থা ছিল? ভলতেয়ার ও রুশো এদের কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন?

২। ষোড়শ লুই কেন সাধারণ রাষ্ট্রসভার অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন? জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? কে তাদের নেতা ছিলেন?

৩। কি কারণে প্যারিসের জনতা ব্যাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করেছিল? ব্যাস্তিল দুর্গের পতনের ফলে ফ্রান্সে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল?

৪। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা কি কি সংস্কার করেছিল?

৫। কি কারণে পশ্চিম ইউরোপের রাজাদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়? এর ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে কি পরিবর্তন হয়?

৬। জ্যাকোবিন বলতে কাদের বোঝায়? তাদের একজন বিখ্যাত নেতার নাম কর।

৭। নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান কেন সম্ভব হয়েছিল? কি ভাবে তিনি ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৮। বিশ্বের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্ব কি?

অষ্টম অধ্যায়

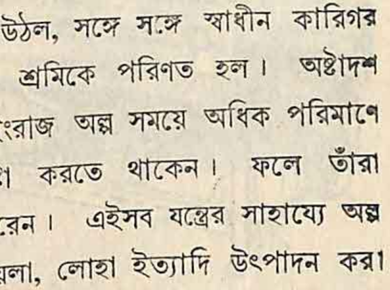
শিল্পবিপ্লব

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে আছে দুটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। একটি ফরাসী বিপ্লব, আর একটি শিল্পবিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব সাম্য ও গণতন্ত্রের দাবী প্রতিষ্ঠা করে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুতর পরিবর্তন এনেছিল। শিল্পবিপ্লব এনেছিল মানুষের কাজকর্ম, যানবাহন ও জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন। শিল্পবিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মত হঠাৎ প্রচণ্ড আকারে দেখা দেয়নি। এই বিপ্লব এসেছিল ধীরে ধীরে—অনেক দিন ধরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে এই বিপ্লবের সূচনা দেখা দেয় এবং ক্রমে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পবিপ্লবের কারণ—রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষ দিকে দুঃসাহসী ইংরাজ নাবিকেরা সমুদ্র জয় করে ইংল্যাণ্ডের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তখন থেকে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। এই অর্থ-সম্পদ দেশের বণিক শ্রেণীর হাতে জমা হয়। এই থেকে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়।

পূর্বে আমাদের দেশের মত ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। পল্লীজীবনই ছিল তাদের আদর্শ; কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়। কাপড়, জুতা, জামা, এবং জীবনধারণের জন্য অন্য যা কিছু প্রয়োজন হত তাও তারা গ্রামের মধ্যেই তৈরী করে নিত। গ্রাম্য শিল্পী ও কারিগরেরা নিজেদের

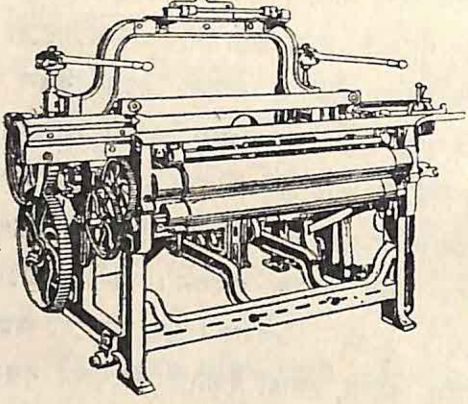
হাতে তৈরী এই সব জিনিস গ্রামের হাটে বাজারে নিজেরাই বিক্রয় করত; তাদের লাভের অংশে আর কেউ ভাগ বসাতে পারত না। কিন্তু এ ব্যবস্থা ক্রমে বদলে গেল। ধনী বণিকেরা তাদের অর্থের জোরে গ্রাম্য শিল্পী ও কারিগরের নিকট থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বিদেশের শহরে বন্দরে বেশী দামে বিক্রয় করতে শুরু করল। এতে তাদের প্রচুর লাভ হতে থাকে। তারা ক্রমে শিল্পী ও কারিগরদের মাহিনা দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র তৈরীর কাজে নিযুক্ত করল। তখন ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন কারিগর এবং শিল্পীরা পরাধীন চাকুরীজীবী শ্রমিকে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকজন ইংরাজ অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করবার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে তাঁরা কয়েকটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কাপড়, কয়লা, লোহা ইত্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আরও জটিল এবং দামী যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল। দেশময় বড় বড় কারখানা গড়ে উঠল। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজগতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে যার ফলে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনধারাই বদলে যায়।



হস্তচালিত তাঁত

বয়ন-শিল্পের উন্নতি—উৎপাদন ব্যাপারে প্রথম পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বস্ত্র-শিল্পে। জন কে নামে একজন ল্যাঙ্কাশায়ারবাসী 'উড়ন্ত মাকু' (flying shuttle)

নামে এক নূতন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সাধারণ তাঁতে এই মাকু ব্যবহার করে কাপড় বোনা সহজ হয়ে ওঠে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যন্ত্রচালিত তাঁতে যত তাড়াতাড়ি কাপড় বোনা যেত, তাঁতীরা তত তাড়াতাড়ি সূতো কেটে জোগাতে পারত না। কাজেই কাপড়ের উৎপাদন বেড়ে গেলেও প্রচুর পরিমাণে সূতোর অভাব দেখা দিল। যন্ত্রের সাহায্যে যাতে তাড়াতাড়ি সূতো কাটারও বন্দোবস্ত করা যায় সেদিকে এবার লোকে মন দিল। হারগ্রীভস্ নামে একজন ক্ষৌরকার এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন যে তাতে একসঙ্গে আটগাছা এবং ক্রমে একশ' গাছা সূতো কাটা যেত।


যন্ত্রচালিত তাঁত

হারগ্রীভস্ তাঁর স্ত্রী জেনীর নামে এই নূতন যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'সূতোকাটা জেনী' (Spinning Jenny)। কিছুদিন পরে রিচার্ড আর্করাইট জলস্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর এক রকমের সূতো কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর এই যন্ত্রের নাম ছিল 'ওয়াটার ফ্রেম'। আর্করাইট এবং হারগ্রীভসের যন্ত্র দুটিকে একত্র করে ক্রম্পটন আরও উন্নত ধরণের সূতো কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এরপরে কার্টরাইট নামে একজন পাদ্রী এক রকম জলস্রোত-চালিত কলের তাঁত (Power loom) আবিষ্কার করেন। এইভাবে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হতে থাকে। ক্রমে জলস্রোতে চালিত তাঁতও উঠে

যায়। জেমস্ ওয়াট বাষ্পের শক্তিকে যন্ত্র-পাতির কাজে লাগাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তখন বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা তাঁত চালাতে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করল। এতে উৎপাদনের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেল যে বস্ত্রশিল্পে যুগান্তর দেখা দিল।



জেম্‌স ওয়াট

কয়লা ও লৌহ শিল্পের উন্নতি—বাষ্প উৎপাদনে কয়লার প্রয়োজন এবং যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা তৈরী করবার জন্য দরকার ভাল লোহা। তাই কয়লা ও লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য এই সময়ে নানা রকম চেষ্টা চলেছিল। উত্তর ইংল্যাণ্ডের কতকগুলি জায়গায় ভাল কয়লার খনি আছে। এই সব খনি থেকে প্রচুর কয়লা তোলার ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় লৌহশিল্পেরও উন্নতি হ'ল। পূর্বে ধাতুপ্রস্তর থেকে লোহা গলিয়ে আলাদা করে নেবার জন্য কাঠকয়লা ব্যবহার করা হত। এখন পাথুরে কয়লার ব্যবহার সুলভ হওয়ায় লৌহ-উৎপাদন সহজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারকম লোহার যন্ত্রপাতিও তৈরী হতে থাকে।

কৃষির উন্নতি—অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে একদিকে যেমন শিল্পোন্নতি দেখা দিয়েছিল তেমনি অন্য দিকে চাষের পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। আগে প্রত্যেক দু বৎসর অন্তর চাষীরা জমি চাষ না করে পতিত রেখে দিত। কারণ একই জমিতে প্রত্যেক বৎসর চাষ করলে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদন-শক্তি হ্রাস পায়। টাউনসেণ্ড নামে একজন বড় জমিদার দেখালেন যে, কোন জমিতে একটা ফসল

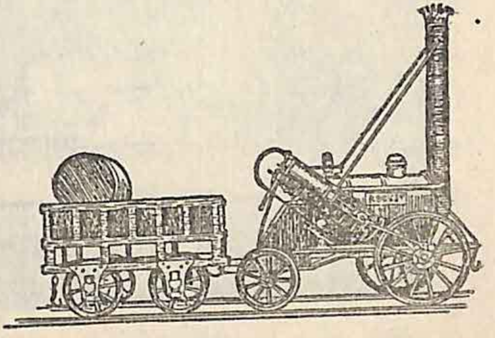
তোলবার পর সেখানে শালগম বা গাজরের চাষ করলে সে জমির উর্বরতা কমে না, বরং তারপর সেই জমিতে যব চাষ করলে চমৎকার ফসল হয়। ক্রমে টাউনসেণ্ডের নির্দিষ্ট উপায়ে চাষ করে জমির ফসল বৃদ্ধি পেল এবং কোন জমিই আর পতিত রাখবার প্রয়োজন রইল না। পূর্বে জমি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে চাষ করা হত। যন্ত্রের সাহায্যে চাষের জন্য বড় জমির প্রয়োজন হওয়ায় ছোট ছোট জমি একত্র করে চাষের জমি তৈরী করা হ'ল। এইভাবে কৃষি-ব্যবস্থায় আদিম যুগের অবসান হয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন হ'ল।

রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি—শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনেরও উন্নতি হয়েছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সেগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডে তখন ভাল রাস্তাঘাট ছিল না। রোমান আমলে যাতায়াতের জন্য কতকগুলি রাস্তা তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে প্রায় দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছরের অযত্নে সেগুলি ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যায়। রাস্তায় এত বেশী কাদা জমত যে গাড়ীর চাকা আটকে যেত এবং আরোহীদের রাস্তায় নেমে গাড়ী ঠেলতে হত। ঘোড়ায়-টানা ভারী ভারী কয়লা ও অন্য নানারকম জিনিসপত্র বোঝাই গাড়ী যখন এগুলির উপর দিয়ে যাতায়াত করত, তখন তার চাপে ভাঙা রাস্তাগুলির দুর্দশা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য ম্যাক্ অ্যাডাম নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী



প্রাচীন কালের জাহাজ

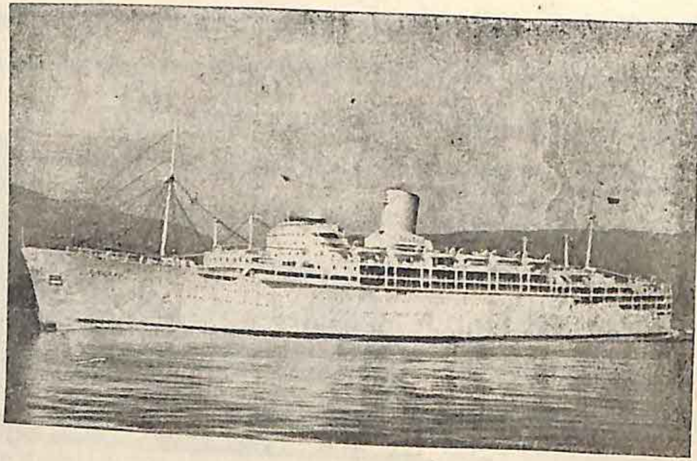
রাস্তা তৈরীর নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। বড় বড় পাথর ব্যবহার না করে তিনি রাস্তা তৈরীর কাজে ছোট ছোট পাথরের কুচি ও ইট ব্যবহার করা আরম্ভ করলেন। এর ফলে নূতন রাস্তাগুলির বন্ধুরতা দূর হল এবং গাড়ী চলারও খুব সুবিধা হল। পূর্বে ম্যানচেষ্টার থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে লণ্ডনে আসতে সাড়ে চার দিন লাগত, পরে সেখানে লাগত মাত্র একদিন। জলপথে জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে যাবার জন্য এই সময়ে অনেকগুলি নূতন নূতন খাল কাটা হয়েছিল।



স্টিফেন্সনের উদ্ভাবিত বাষ্পীয়-ইঞ্জিন

এরপর জর্জ স্টিফেন্সন্ যখন গাড়ী টানার জন্য বাষ্পীয়-ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন, তখন যাতায়াত ব্যবস্থায়ও যুগান্তর ঘটল। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেলপথ নির্মিত হতে থাকে এবং দু'দিনের পথ দু'ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব হয়। বাষ্পীয়-ইঞ্জিন জাহাজেও ব্যবহার করা হতে থাকে। সাইমিংটন নামে এক স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রথম বাষ্পীয়-ইঞ্জিন চালিত জাহাজ চালিয়েছিলেন।

শিল্পবিপ্লবের ফল—যে সব আবিষ্কারের কথা বলা হ'ল তাতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানারকম জিনিসপত্র উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছিল। এই জন্যই একে শিল্পবিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডবাসীরা অন্য দেশে তাদের শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রী করে প্রচুর ধনসম্পত্তি আহরণ করেছিল। দেশের সর্বত্র



বাষ্পীয়-ইঞ্জিন চালিত জাহাজ

বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে হাজার হাজার মজুর নিযুক্ত হয়েছিল। পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও এই রকম হয়েছিল। এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ধীরে ধীরে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলছে।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফল কেবল যে ভালই হয়েছে তা নয়। এর ফলে ইংল্যাণ্ডের কুটিরশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তখন জীবিকা উপার্জনের জন্য বেকার গ্রামবাসীরা বড় বড় শিল্পপ্রধান শহরে এসে ভীড় করল। এগুলি যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল তখন ভাল করে শহর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। শ্রমিকদের থাকবার জন্য কারখানাগুলিকে ঘিরে সুবিধামত যেখানে সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী করা হত। সেগুলি ছিল যেমন নোংরা, তেমনি আলোবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর। আর

এরই মধ্যে হাজার হাজার শ্রমিক দিন কাটাতে বাধ্য হত। ফলে তাদের স্বাস্থ্য, রুচি, সুনীতি সবই ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে কারখানার মালিকেরা কেবল লাভের দিকে নজর রাখতেন, উৎপাদনের খরচ যত কমান যায় তার চেষ্টা করতেন। এইজন্যও এই সময়ে শ্রমিকদের দুর্দশার সীমা ছিল না। পুরুষ, নারী, এমন কি বালক-বালিকাদেরও দিনে চৌদ্দ কিংবা ষোল ঘণ্টা খাটতে হত। তাদের চাকুরীরও কোন রকম স্থায়িত্ব ছিল না। যখন-তখন মালিকের খুশিমত তাদের চাকুরী যেত বা বেতন কমে যেত। অল্প মজুরীতে কাজ করান যায় বলে কারখানাগুলিতে বহু শিশু-শ্রমিক নিয়োগ করা হত। এরা সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ছটা, এমন কি রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করত। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে শিশু-শ্রমিকেরা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তা দেখার জন্য কারখানার মালিকেরা একদল কর্মচারী নিযুক্ত করত এবং তারা শিশুদের উপর প্রহার করত, নানারকম অত্যাচার চালাত।

উৎপীড়িত শ্রমিকেরা ক্রমশঃ কারখানা জীবন ও কারখানার মালিকদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ডের নটিংহামশায়ারে একদল শ্রমিক দাঙ্গা আরম্ভ করে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্য ডেকে এই দাঙ্গা থামাতে হয়।

কারখানার কুব্যবস্থাগুলির প্রতি ক্রমে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁদের চেষ্টায় কারখানা-আইন পাশ করে শ্রমিকদের নানা রকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক দেশে কারখানাগুলিকে রাষ্ট্রের অধীনে এনেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করবার

চেষ্টা চলছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার অবসান কি করে করা যায় এটি এখনকার একটি মস্তবড় সমস্যা।

শিল্পবিপ্লবের কুফল যতই থাকুক না কেন, একথা মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষ অশেষ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। সে সম্পদ সমগ্র সমাজের কল্যাণে নিয়োগ করলে মানুষের সভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করবে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৭৬৫—হারগ্রীভসের স্পিনিং জেনী
১৭৬৯—ওয়াটের বাষ্পীয়-ইঞ্জিন
১৭৮৫—কার্টরাইটের কলের তাঁত
১৮২৯—স্টিফেন্‌সনের ইঞ্জিন

অনুশীলনী

১। শিল্পবিপ্লব বলতে কি বোঝা যায়? কেন একে বিপ্লব বলা হয়? কোথায় এবং কখন এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল?

২। কিভাবে বস্ত্র উৎপাদনে যুগান্তর এসেছিল? কয়লা এবং লৌহ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কি সুবিধা হয়েছিল? কি ভাবে যানবাহনের উন্নতির সূচনা হয়েছিল?

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষিশিল্পের কি উন্নতি হয়েছিল?

৪। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কি কি শুভ ও অশুভ ফল দেখা দিয়েছিল?

নবম অধ্যায়

ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যলাভ

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিল। তাই ইউরোপের পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ এবং স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে ইটালী ও জার্মানীতে আমরা যে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখতে পাই তার মূলেও ছিল ফরাসী বিপ্লবের এই বাণী। বহুকাল ধরে ইটালী ও জার্মানীর কোনরকম রাজনৈতিক একতা ছিল না, ইটালীর আবার স্বাধীনতাও ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই এই দুটি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল।

ঐক্যলাভের পূর্বে ইটালীর অবস্থা—ইটালীর দুর্বলতা ও একতার অভাবের সুযোগ নিয়ে স্পেন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্র সেখানকার নানা অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত ইটালীই নিজের অধীনে এনেছিলেন। এইভাবে পূর্বের মত পরাধীন থাকলেও নেপোলিয়নের অধীনে ইটালী কিছুটা রাজনৈতিক ঐক্য পেয়েছিল।

নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের বড় বড় রাজনীতিবিদেরা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সম্মিলিত হন। তাঁরা ইউরোপের দেশগুলিকে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এর ফলে ইটালী আবার বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর ইটালীর

লম্বার্ডি এবং ভেনিস অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। এছাড়া সেখানকার আরো কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে অস্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপিত হয়। মধ্য এবং দক্ষিণ ইটালী পোপ ও স্পেন রাজবংশের এক শাখার অধিকারভুক্ত করা হয়েছিল। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত পিডমণ্টে এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপে একটি স্বাধীন ইটালীয় রাজবংশ রাজত্ব করবার অধিকার পেলেন।

ইটালীতে স্বাধীনতার আন্দোলন ও ম্যাৎসিনি—নূতন শাসন-ব্যবস্থায় কিন্তু দেশপ্রেমিক ইটালীবাসীরা সন্তুষ্ট হলেন না। দেশের ঐক্য ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁরা তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। তখন 'কার্বোনারী' নামে দেশব্যাপী একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রচেষ্টায় ইটালীবাসীরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তিনবার বিদ্রোহী হয়েছিল।



ম্যাৎসিনি

এই সময়ে ইটালীতে ম্যাৎসিনি নামে একজন অসীম প্রতিভাশালী বক্তা ও লেখকের আবির্ভাব হয়। তিনিও ছিলেন এই 'কার্বোনারী' দলের সভ্য। তিনি তাঁর লেখা এবং বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দেশবাসীদের পূর্ব গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল ইটালীতে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিদেশী শাসকদের কুনজরে পড়ে তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়। বিদেশে গিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি 'নবীন ইটালী' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

১৮৪৮ সনের আন্দোলন—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে আবার এক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। পূর্বের বিপ্লবের মত এই নূতন বিপ্লবের প্রভাবও সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইটালীও বাদ গেল না। পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা তখন উত্তর ইটালী থেকে অস্ট্রিয়ার সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। ইটালীর অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারাও নিজেদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে স্বীকৃত হন। ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে রোমে এই সময়ে কিছুদিনের জন্য একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়া কিছুকালের মধ্যে ইটালীর এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হল।

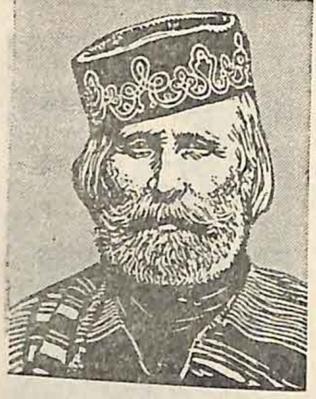
কাভুর—সামরিক শক্তি এবং অত্যাচারের দ্বারাও অস্ট্রিয়া ইটালীবাসীদের মন থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করতে পারল না। ১৮৪৮এর বিদ্রোহের দশ বছরের মধ্যেই তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'ল। এই সময়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল ও তাঁর সুযোগ্য এবং কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী কাভুর। কাভুরের উদ্দেশ্য ছিল রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অধীনে সমস্ত ইটালীকে একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত করা। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশের ঐক্য আনতে হলে তাঁকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অথচ পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, এজন্য বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কাভুর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড


কাভুর

ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করেন এবং তাদের সহানুভূতি লাভ করেন। এর চার বৎসর পরে তিনি ফ্রান্সের সাহায্য নিয়ে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লম্বার্ডি প্রদেশ কেড়ে নিলেন।

অস্ট্রিয়ার এইভাবে পরাজয় হওয়াতে ইটালীবাসীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হল, এবং সমস্ত দেশব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হ'ল। উত্তর ও মধ্য ইটালীর স্বেচ্ছাচারী রাজাদের বিতাড়িত করে সেখানকার লোকেরা সার্ডিনিয়ার রাজার অধীনে এসে মিলিত হয়। মধ্য ইটালীতেও পোপের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে গেল।

গ্যারিবল্‌ডি—দক্ষিণ ইটালীর সিসিলি এবং নেপল্‌স্ মুক্ত করেন গ্যারিবল্‌ডি নামে ইটালীর একজন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা। কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যের সাহায্যে তিনি এই অসমসাহসিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। গ্যারিবল্‌ডি ছিলেন ম্যাৎসিনির শিষ্য এবং 'নবীন ইটালী' সমিতির সভ্য। গুপ্ত সমিতির সভ্য বলে তাঁকেও বহুকালের জন্য বিদেশে থাকতে হয়েছিল। গ্যারিবল্‌ডি এবং কাভুর ছিলেন দুটি স্বতন্ত্র দলের নেতা। ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করা দুজনের উদ্দেশ্য হলেও তাঁদের পন্থা ছিল ভিন্ন। কিন্তু গ্যারিবল্‌ডি বুঝেছিলেন যে, সার্ডিনিয়ার রাজার সাহায্য ছাড়া ইটালীকে এক করবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি নিজের মত বিসর্জন দিয়ে কাভুরের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং সিসিলি ও নেপল্‌স্ সার্ডিনিয়ার সঙ্গে এক ইটালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।


গ্যারিবল্‌ডি

কাভুর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ভেনিস ও রোম বাদে সমগ্র ইটালীকে একত্র করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই দুটি স্থানও শীঘ্রই ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইটালী ভেনিস অধিকার করে। এর কিছুকাল পরে রোমও ইটালীবাসীদের হাতে চলে আসে। এইভাবে ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্‌ডি ও কাভুর—এই তিনজন সুযোগ্য নায়কের নেতৃত্বে ইটালী এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়।

ঐক্যলাভের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা—বর্তমান যুগের আরম্ভে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এই রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা ছিল তিনশতেরও বেশী। এর মধ্যে প্রাশিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নেপোলিয়ন এই রাজ্যটি বাদে প্রায় সমস্ত জার্মানী অধিকার করেন। জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করে তিনি মাত্র উনচল্লিশটি রাজ্য গঠন করেন। এইভাবে নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে জার্মানীতেও একতার সূত্রপাত হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী জার্মান জনসাধারণকে পূর্বেই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এখন নেপোলিয়নের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টার ফলে জার্মানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদেরও উন্মেষ হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীতেও ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে আনা হয়। ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল তাতে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয় অস্ট্রিয়াকে এবং তার পরেই ছিল প্রাশিয়ার স্থান। এই শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করবার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হ'ল।

জার্মানীতে স্বাধীনতার আন্দোলনঃ ফ্রাঙ্কফার্টের সম্মেলন—ইটালীয়দের মত দেশপ্রেমিক জার্মানেরাও তাদের দেশে ঐক্য এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল জার্মানীতে তা প্রবল আকার ধারণ করে। জার্মানীর অনেক রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হ'ল। ছোট ছোট বহু রাজ্যের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ তখন এক নূতন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করবার জন্য ফ্রাঙ্কফার্ট শহরে মিলিত হলেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়মকে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সমস্ত জার্মানীর রাজমুকুট গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া শক্তি সঞ্চয় করে জার্মানীর এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিল।


বিসমার্ক

বিসমার্কের অভ্যুত্থান ও জার্মানীর ঐক্যলাভ—প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ামের পুত্র প্রথম উইলিয়ামের অসীম আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক। কূটনীতিতে তখন কেউ বিসমার্কের সমকক্ষ ছিল না। প্রাশিয়ার নবগঠিত সৈন্যদলের সহায়তায় জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব লোপ করে প্রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তবে

গণতন্ত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন।

বিসমার্ক জানতেন যে অস্ট্রিয়াকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করতে হলে যুদ্ধের প্রয়োজন। স্লেজউইগ ও হলষ্টিন নামে দুটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার নিয়ে তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিবাদ শুরু করলেন। ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার মধ্যে সাত সপ্তাহব্যাপী এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুশিক্ষিত প্রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে অস্ট্রিয়ার পরাজয় হল। ফলে সমস্ত উত্তর জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়া বিতাড়িত হল, এবং সেখানে প্রাশিয়ার প্রভাব প্রবল হ'ল। এখন বাকী রইল শুধু দক্ষিণ জার্মানী।

এর পরে বিসমার্ক দেখলেন যে, দক্ষিণ জার্মানীতে প্রতিপত্তি স্থাপন করতে হলে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সেজন্য তিনি একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের অধিপতি ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। স্পেনের সিংহাসনে কে বসবে—এই প্রশ্ন নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে ফরাসীদের ভীষণ পরাজয় হ'ল। তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং ফ্রান্সে আবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিসমার্ক ফরাসীদের কাছ থেকে আলসেস-লোরেন প্রদেশ দুটি কেড়ে নিলেন এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন। এই যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জয়লাভের পর জার্মান রাষ্ট্রগুলির অনুরোধে প্রাশিয়ার রাজা সমগ্র জার্মানীর সম্রাট বলে ঘোষিত হন। প্যারিসের উপকণ্ঠে ফরাসী রাজাদের ভার্সাই প্রাসাদে তাঁর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইভাবে বিসমার্কের কূটনীতি ও প্রাশিয়ার সৈন্যদের শক্তির বলে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৪৮—তৃতীয় ফরাসী বিপ্লব

১৮৪৮-৪৯—ফ্রাঙ্কফার্টের সম্মেলন

১৮৫৫—ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সার্ডিনিয়ার যোগদান

১৮৫৯-৬০—অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ

১৮৬৬—অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ

১৮৭০-৭১—ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ

অনুশীলনী

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইটালী ও জার্মানীর অবস্থা কিরূপ ছিল? এই দুইটি দেশে ফরাসী বিপ্লবের কি প্রভাব দেখা দিয়েছিল? নেপোলিয়ন কিভাবে এই দুইটি দেশের ঐক্যলাভের সহায়তা করেন? ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া জার্মানী ও ইটালীতে কিভাবে দেখা দিয়েছিল? কিভাবে এবং কাদের চেষ্টায় এই দুইটি দেশ ঐক্যলাভ করেছিল?

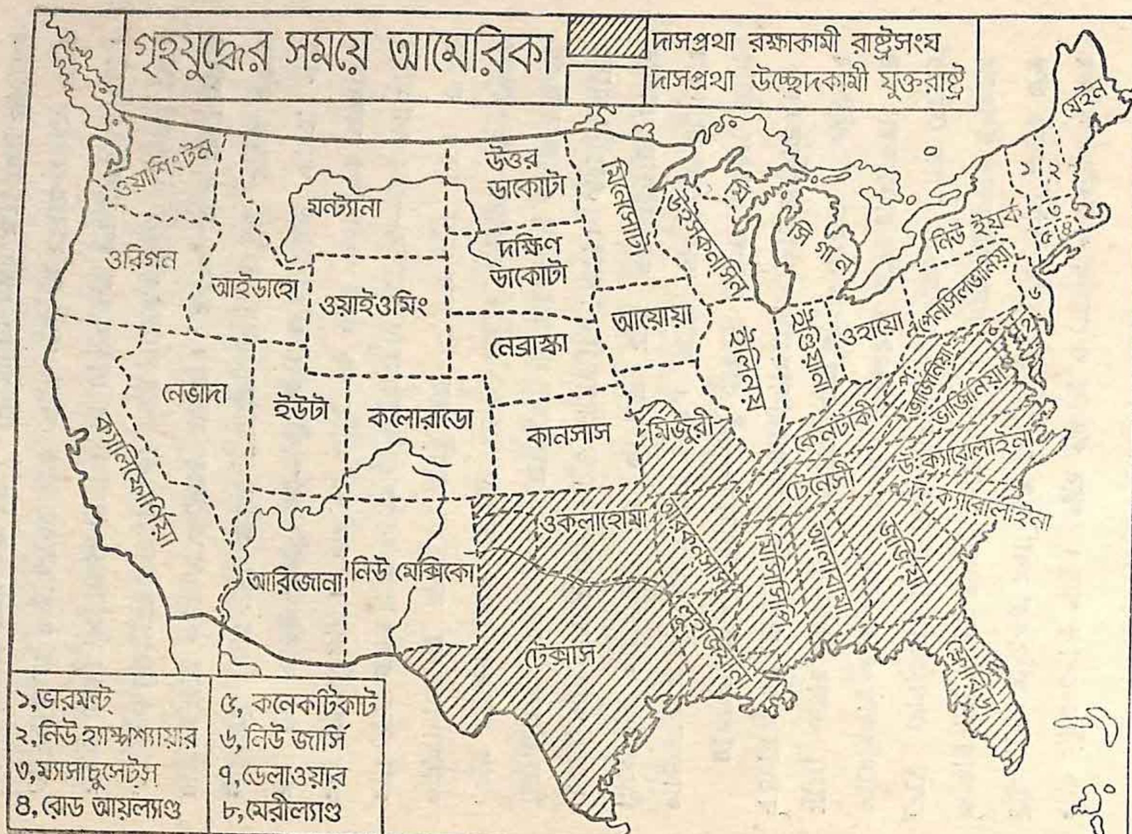
দশম অধ্যায়

আমেরিকায় দাসপ্রথার উচ্ছেদ

বর্তমান যুগের ইউরোপে দাসপ্রথার উদ্ভব—বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। রোমান আমলে এই প্রথা ইউরোপে খুব প্রসার লাভ করেছিল। রোমের ধনী ব্যক্তিরা সকলেই কিছু কিছু ক্রীতদাস রাখতেন। তখন প্রকাশ্য বাজারে জীবজন্তুর মতই ক্রীতদাসদের বেচাকেনা চলত। সাধারণতঃ যুদ্ধের পরে বিজয়ী দল বিজিত দেশের লোকেদের ধরে এনে বাজারে বিক্রী করত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই নিষ্ঠুর প্রথা ইউরোপ থেকে

ধীরে ধীরে লোপ পায়। পরে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের বণিকেরা নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় চাষের কাজ করার জন্য আবার দাস বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। তারা আফ্রিকার উপকূলে নেমে সেখানকার নিগ্রোদের ছলে-বলে ভুলিয়ে বা লোভ দেখিয়ে আমেরিকায় ধরে নিয়ে আসত। সেখানকার জমির মালিকেরা অল্প মূল্যে এদের কিনে নিয়ে চাষের কাজে নিযুক্ত করতেন। এইভাবে বর্তমান যুগের গোড়ার দিকে পুরোনো দাসপ্রথা আবার প্রবর্তিত হয়।

দাসদের প্রতি অত্যাচার—এই প্রথাটি ক্রমশঃ একদল লোক লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করল। তাদের কাজই ছিল আফ্রিকার নিগ্রোদের মালপত্রের মত জাহাজে করে আমেরিকায় চালান দেওয়া, আর সেখানে প্রচুর লাভে তাদের বিক্রী করা। এরা নিগ্রোদের ঠিক জীবজন্তুর মত দেখত। জাহাজের সবচেয়ে নীচের ডেকে হাত-পা বেঁধে তাদের রেখে দেওয়া হত। সঙ্কীর্ণ জায়গায় বন্ধ থেকে আলোবাতাসের অভাবে পথেই বহু নিগ্রোর মৃত্যু হত। জমির মালিকেরা এদের সঙ্গে আরও বেশী দুর্ব্যবহার করতেন—যেন এরা মানুষ নয়, কুকুর-বিড়াল। দাসদের প্রতি কি রকম অমানুষিক অত্যাচার করা হত তারই একটি মর্মস্পর্শী এবং জীবন্ত চিত্র আমরা পাই হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো প্রণীত "আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন" নামক বইতে দাসদের ভাল করে খেতে দেওয়া হত না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এতটুকুও বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হত। কাজে একটু শিথিলতা দেখা দিলে চাবুকের ঘা পড়ত তাদের পিঠে। কেউ যদি এই অত্যাচারের হাত থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত তাহলে তাকে হত্যা করা হত। নিগ্রোদের হত্যা করা তখন আইনের চোখে অপরাধ ছিল না।



গৃহযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা
দাসপ্রথা রক্ষাকামী রাষ্ট্রসংঘ
দাসপ্রথা উচ্ছেদকামী যুক্তরাষ্ট্র
ওয়াশিংটন
ওরিগন
আইডাহো
মন্ট্যানা
ওয়াইওমিং
উত্তর ডাকোটা
দক্ষিণ ডাকোটা
নেব্রাস্কা
মিনেসোটা
আয়োয়া
উইসকনসিন
মিশিগান
ইলিনয়
ইণ্ডিয়ানা
ওহায়ো
পেনসিলভানিয়া
নিউ ইয়র্ক
মেইন
নেভাদা
ক্যালিফোর্ণিয়া
ইউটা
কলোরাডো
কানসাস
মিজুরী
আরিজোনা
নিউ মেক্সিকো
ওকলাহোমা
টেক্সাস
আরকনসাস
লুইজিয়ানা
মিসিসিপি
আলাবামা
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
টেনেসী
কেনটাকী
ভার্জিনিয়া
উ: ক্যারোলাইনা
দ: ক্যারোলাইনা
১,ভারমন্ট
২,নিউ হ্যাম্পশ্যায়ার
৩,ম্যাসাচুসেটস্
৪,রোড আয়ল্যাণ্ড
৫, কনেকটিকাট
৬,নিউ জার্সি
৭,ডেলাওয়ার
৮,মেরীল্যাণ্ড

ইউরোপে দাসপ্রথার বিলোপ—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মানবহিতৈষী বহু ব্যক্তি একে দূর করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। শেষে উইলবারফোর্স নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হয়। ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইউরোপের অন্য সব দেশেও এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আমেরিকায় গোলযোগ—আমেরিকায় কিন্তু ব্যাপারটার এত সহজে মীমাংসা করা সম্ভব হ'ল না। উত্তরাঞ্চলের লোকদের প্রধান জীবিকা ছিল শিল্প ও বাণিজ্য। সেখানে কারখানাতে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরা কাজ করত। দক্ষিণের লোকেরা কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। দাসদের দ্বারা তারা চাষের কাজ সহজভাবে ও কম খরচে করতে পারত। উত্তরাঞ্চলে কারখানার মালিকেরা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক জোগাড় করতে পারতেন না। তাই দক্ষিণ অঞ্চলের দাসদের মুক্ত করে তাদের কারখানাতে নিযুক্ত করবার জন্য তারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা তাদের চাষ-আবাদের প্রকাণ্ড ক্ষতির কথা চিন্তা করে কিছুতেই তাতে রাজী হ'ল না। আমেরিকার উপনিবেশগুলি যতই বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল, ততই নূতন নূতন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে দাসপ্রথা থাকবে কি না এই নিয়ে উত্তর-দক্ষিণের বিবাদ বেড়ে চলল। আপোষ-মীমাংসার নানা রকম চেষ্টা নিষ্ফল হবার পর দক্ষিণের লোকেরা ঘোষণা করল যে তারা একটা আলাদা রাষ্ট্র গড়ে তুলবে।

এব্রাহাম লিঙ্কন—এই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হলেন এব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি ছিলেন আমেরিকার দাসপ্রথা-বিরোধী দলের নেতা। দক্ষিণের লোকদের তিনি জানিয়ে দিলেন যে আলাদা রাষ্ট্র তাদের কোন মতেই গড়তে দেওয়া হবে না। লিঙ্কন

ছিলেন অতি সাধু প্রকৃতির এবং দৃঢ়চরিত্র ব্যক্তি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেণ্টাকী প্রদেশে খুব গরীব এক কৃষকের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ছোটবেলায় লিঙ্কনের লেখাপড়া শিখবার খুব বেশী সুযোগ ছিল না। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি কষ্ট করে বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতেন। এইভাবে কেবলমাত্র নিজের অধ্যবসায় এবং প্রতিভা দ্বারা ক্রমে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি যা ভাল বলে মনে করতেন সে কাজ থেকে তিনি কখনও সরে আসতেন না। ছেলেবেলাতেই দাসপ্রথার নিষ্ঠুরতা তাঁকে খুব বিচলিত করে তোলে। কাজেই তিনি দাসপ্রথার উচ্ছেদ কামনা করতেন।



এব্রাহাম লিঙ্কন

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) ও দাসপ্রথার বিলোপ— লিঙ্কন যখন দক্ষিণের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, তারা কোনমতেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে না, তখন তারা উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রায় চার বছর ধরে আমেরিকায় এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল। দাসপ্রথার বিস্তার বন্ধ করতে হবে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া হবে না—এই সঙ্কল্প নিয়ে লিঙ্কন অবিচলিতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। শেষে দক্ষিণের লোকেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন

আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের ক্রীতদাসদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই আমেরিকায় সর্বত্র দাসপ্রথা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়।

গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের জয় হওয়ার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দূর হয় এবং নিগ্রোরাও ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার লাভ করে। কিন্তু কাগজে কলমে তাদের অধিকার দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে কালো চামড়ার প্রতি সাদা চামড়াদের বিদ্বেষ রয়েই গেল। দক্ষিণের লোকেরা নানা রকম গুপ্ত সমিতি গঠন করে নিগ্রোদের উপর গোপনে অত্যাচার করতে থাকে। এই বর্ণসমস্যার সমাধান করা এখনও সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সভাপতি জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি এই জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এব্রাহম লিঙ্কনের মতো তাঁকেও আততায়ীর হস্তে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৬১-৬৫—গৃহযুদ্ধ

১৮৬৫—আমেরিকায় দাসপ্রথার বিলোপ

অনুশীলনী

১। বর্তমান যুগের ইউরোপে দাসপ্রথার প্রবর্তন কেন হয়? দাস ব্যবসায়ীরা কেন আমেরিকার ক্রীতদাসদের চালান দিত?

২। কি ভাবে ইউরোপে ও আমেরিকায় দাসপ্রথার উচ্ছেদ হয়?

৩। এব্রাহাম লিঙ্কন সম্বন্ধে কি জান?

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কি ফল হয়েছিল?

একাদশ অধ্যায়

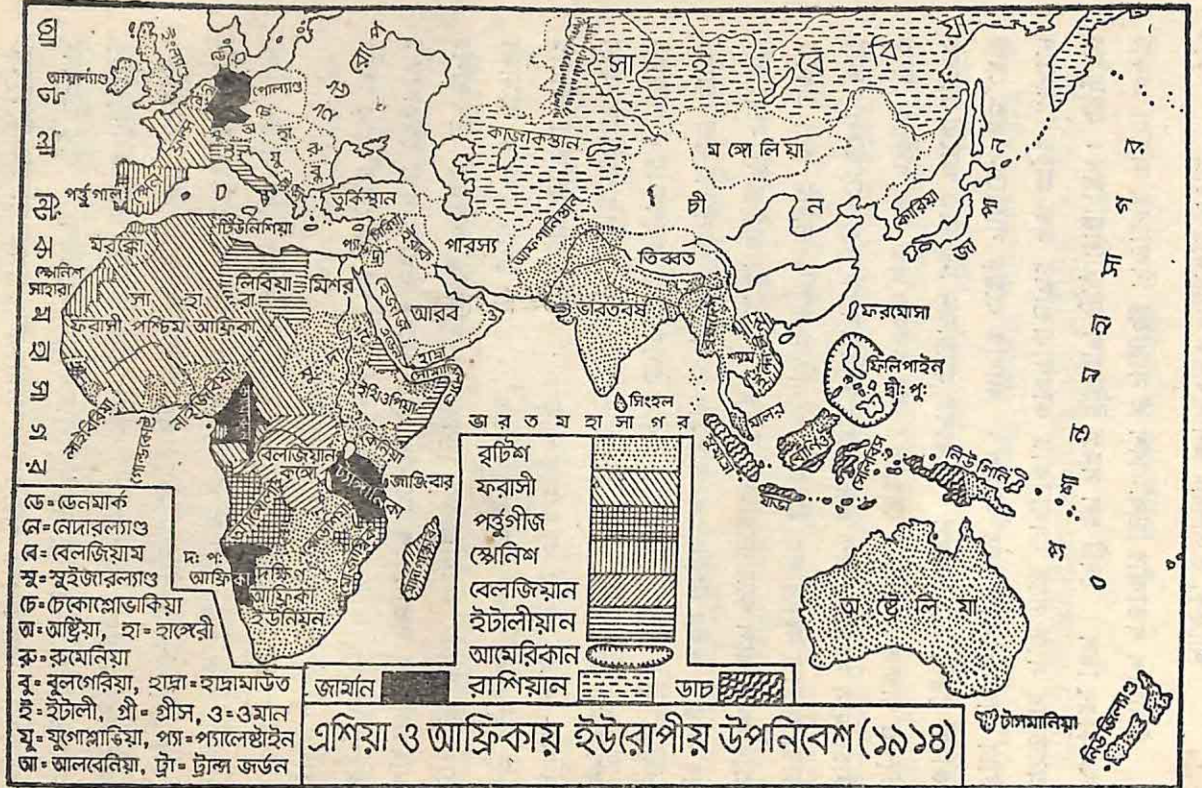
আফ্রিকা ও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য বিস্তার ও তার কারণ—আমরা এর আগে জেনেছি যে, নূতন দেশ আবিষ্কারের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্য করে ইউরোপের অধিবাসীরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। তার ফলে এই দুটি দেশে শুধু যে কেবল ইউরোপীয় ধর্ম, আচার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষা-দীক্ষাই প্রবর্তিত হয়েছে তা নয়, এখানকার আদিবাসীরাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। এই দেশ দুইটি এখন ইউরোপের অধিবাসীদের বংশধরদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন ছাড়াও ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর আরো কয়েকটি অঞ্চলে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। যেমন, ইংরাজ, ওলন্দাজ ও রাশিয়ানরা যথাক্রমে ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক অধিকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কারণ এই সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হওয়ায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া-আসা অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তাই ইউরোপের বহু লোক তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করে দূর দূর দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এই ভাবেই ইংরাজদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের আরো একটি বড় কারণ ছিল। সেটি হল সমগ্র ইউরোপ জুড়ে শিল্পবিপ্লব। যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার কারখানাগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল দরকার হতে লাগল। আবার যন্ত্রের সাহায্যে এত বেশী জিনিস তৈরী হতে লাগল যে দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও আরো অনেক উদ্‌বৃত্ত থাকত। কাজেই সেগুলি বিক্রী করবার জন্য এবং বাইরে থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য ইউরোপের অধিবাসীরা ব্যগ্র হয়ে উঠল। তাই তারা অন্যান্য মহাদেশের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই সব কারণে তখন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ও সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির অসহায়তা ও দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের স্বাধীনতা-হরণ ও অর্থ-শোষণ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জাতিরা তাদের এই শোষণের কথা অস্বীকার করত। তারা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপনকে সমর্থন করবার জন্য বলত যে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদের সভ্য করে তোলা এবং তাদের উন্নতি করা শ্বেতাঙ্গদের অবশ্য কর্তব্য, তাই তারা কষ্ট স্বীকার করে দূর দূর দেশে এসে বসতি স্থাপন ও শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার—উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা এবং এশিয়া ছিল শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান ক্ষেত্র। তখন আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান ছিল অনাবিষ্কৃত এবং সভ্য জগতের অগোচর। কেবল মাত্র উপকূল ভাগের কিছু কিছু অংশের উপর ইউরোপীয়দের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম আফ্রিকায় আসে। তারা এই দেশের পশ্চিম উপকূলের



এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশ (১৯১৪)

আঙ্গোলা প্রদেশ অধিকার করে এবং আরব-বণিকদের কাছ থেকে পূর্ব উপকূলের মোজাম্বিক, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থান কেড়ে নেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজরা যখন প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে তখন তারা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত অধিকার করে। এইভাবে কেপ কলোনী উপনিবেশটির প্রতিষ্ঠা হয়। আফ্রিকার ওলন্দাজরা বুয়র নামে পরিচিত।

আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে এখন আমরা যা জানি তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই অজানা মহাদেশটির গহন অভ্যন্তরে যে সব রহস্য লুকিয়ে আছে তা জানবার জন্য তখন অনেকেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। বহু দুঃসাহসী ভূপর্যটক সেখানকার গভীর বন-জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে একে একে দেশগুলি আবিষ্কার করতে লাগলেন। এইভাবে যে সব জায়গায় শুধু হিংস্র জানোয়ার আর নরখাদক অধিবাসীদের ছাড়া আর কারও পদচিহ্ন পড়ে নি, এঁরা সে সব জায়গায় সভ্যতার আলোক বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সব ভূপর্যটকদের মধ্যে দুজনের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন ডাক্তার লিভিংস্টোন এবং তাঁর বন্ধু স্ট্যান্‌লী।

লিভিংস্টোন ও স্ট্যান্‌লীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—লিভিংস্টোন ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আফ্রিকাতে এসেছিলেন। লিভিংস্টোন তাঁর জীবনের বহু বছর আফ্রিকার গহন অরণ্যের মধ্যে অসভ্যদের দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি এই মহাদেশটির পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল এবং কেপ কলোনী থেকে উত্তরে কঙ্গো নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া প্রপাত তিনিই প্রথম আবিষ্কার

করেন। এত বড় জলপ্রপাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানকার আরও অনেক হ্রদ এবং নদনদী, ঘন বন, শ্যামল প্রান্তর, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, অসংখ্য জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের কথা তিনি সর্বপ্রথম সভ্য জগতের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে গিয়ে কতবার তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে! খাদ্য ফুরিয়ে গেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তবুও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। শেষে ভগ্নদেহ নিয়ে এত পরিশ্রম তাঁর আর সহ্য হল না। আফ্রিকার জঙ্গলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আফ্রিকার অধিবাসীরা তাঁকে দেবতার মত সম্মান করত। এদের কাছে তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। নিগ্রোদের ধরে নিয়ে গিয়ে যে দাস ব্যবসা করা হত, তার বিরুদ্ধে তিনি জনমত গঠন করবার চেষ্টা করেছিলেন। লিভিংস্টোনের অনুচরেরা তাঁকে এত ভালবাসত যে, তিনি মারা যাবার পর তাঁর মৃতদেহ তারা নিজেরাই বহন করে জাঞ্জিবার উপকূল পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে মৃতদেহটি সমাধিস্থ করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ডাক্তার লিভিংস্টোনের মত স্ট্যান্‌লীও একজন দুঃসাহসী অভিযান-কারী ছিলেন। তিনি প্রথম আফ্রিকায় আসেন লিভিংস্টোনের খোঁজে। লিভিংস্টোন যখন আফ্রিকায় ছিলেন তখন একবার প্রায় পাঁচ বছর ধরে সভ্য জগতের সঙ্গে তাঁর কোন রকম যোগাযোগ ছিল না। অবশেষে কৌতূহলী হয়ে আমেরিকার এক খবরের কাগজের অফিস থেকে স্ট্যান্‌লীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর খোঁজে। স্ট্যান্‌লীর সঙ্গে লিভিং-স্টোনের দেখা হয় উজিজিতে। লিভিংস্টোনের শরীর এই সময়ে খুব অসুস্থ ছিল—খাদ্য নেই, লোকজন নেই। স্ট্যান্‌লী গিয়ে তাঁকে খাদ্য, অর্থ, ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

এর পরে লিভিংস্টোনের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য স্ট্যান্‌লী আর একবার আফ্রিকাতে আসেন। তিনি ট্যাঙ্গানিকা হ্রদের চারপাশে অনেক স্থান আবিষ্কার করেন এবং কঙ্গো নদীর উৎপত্তি থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথটি খুঁজে বার করেন। তাঁকে কয়েকবার এখানকার নরখাদক অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আফ্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে ডাঃ লিভিংস্টোনের মত তাঁর নামও চিরদিন বিজড়িত হয়ে থাকবে।

আফ্রিকা বিভাগ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি এই বিশাল মহাদেশটি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করে নেয়। এর কিছুকাল পূর্বে ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার লেসেপ্‌স্ ইউরোপ থেকে ভূমধ্য সাগর হয়ে সোজাসুজি লোহিতসাগরে আসবার জন্য সুয়েজ খাল খনন করেন। এই পথে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসা অনেক সহজ হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ইংরাজদের সাম্রাজ্য ছিল বলে এই খালটির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে তারা খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। খালটি ছিল মিশরের অধিপতি খেদিভদের অধীনে। এঁরা বড় বেহিসাবী ছিলেন এবং নানারকম অপব্যয়ের জন্য তাঁদের বহু ঋণ করতে হত। ঋণের দায়ে তখনকার খেদিভ ইসমাইল পাশা তাঁর সুয়েজ খালের অংশ ইংরাজদের কাছে বিক্রী করে দেন। খালের বাকী অংশ ছিল ফরাসীদের। ইংরাজদের কাছে নিজের অংশ বিক্রী করেও যখন ইসমাইলের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ হল না, তখন ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স এই দুই দেশ মিলে মিশরের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ভার গ্রহণ করল। কিন্তু দেশপ্রেমিক মিশরীরা এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাদের দমন করে ইংরাজরা শুধু মিশরই নয়, সমস্ত নীল নদের উপত্যকার উপরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজেরা যে উপনিবেশটি স্থাপন করেছিল নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ইংরাজরা সেটিও জয় করে নেয়, কারণ ওলন্দাজরা তখন ছিল নেপোলিয়নের অধীনে। ক্রমে উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহ করে ইংরাজরা তাদের সাম্রাজ্যের সীমা আরও বিস্তার করে এবং প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাই তাদের হাতে এসে যায়।

ফরাসীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। মরোক্কো থেকে টিউনিস পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগের উপর তারা অধিকার স্থাপন করেছিল। বিশাল সাহারা মরুভূমি, প্রায় সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকা এবং মধ্য আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলের উপরও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐক্যসাধনের পর জার্মানীরও উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তারা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়ে তোলে। আফ্রিকার অধিবাসীদের অনুন্নত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র রাজ্যও মধ্য আফ্রিকার বিস্তৃত কঙ্গো অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। ইটালীও পূর্ব এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলে তিনটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার—আফ্রিকার মত এশিয়াতেও এই সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চলছিল। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা অনেক পূর্বেই ভারতে ও ইন্দোনেশিয়াতে অধিকার স্থাপন করেছিল। এশিয়াতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল রুশ জাতি। তারা সপ্তদশ শতাব্দীতে এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত সমগ্র সাইবেরিয়া দেশ অধিকার করেছিল। এর পরে মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলিও তারা একে একে জয় করে নেয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা

পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্থানের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত বিশাল চীন দেশের প্রতিও বিদেশীদের দৃষ্টি পড়ে। চীনের ধনসমৃদ্ধি তখন পাশ্চাত্যের সব জাতিগুলিকে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। তাই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি এখানে প্রভাব স্থাপন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এরা সকলেই একে একে চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিজেদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। চীনদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সমগ্র ইন্দোচীন জুড়ে একটি বিশাল ফরাসী রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল।

ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যলিপ্সা এতেও তৃপ্ত হল না। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ছোট ছোট দ্বীপগুলিও তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু এই অঞ্চলে আরও একটি পাশ্চাত্য শক্তি অধিকার বিস্তার করেছিল—সেটি হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকানরা ফিলিপাইন এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপর তাদের আধিপত্য স্থাপন করে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম—এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তিগুলি যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তার ফল তাদের পক্ষে পরিণামে শুভ হয়নি। কারণ অন্য দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে নানারকম কলহ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে। এদিকে বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে ক্রমেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৬৯—সুয়েজ খালের উন্মোচন

১৮৮১-৯০—ইউরোপীয়দের মধ্যে আফ্রিকা বণ্টন

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেন ইউরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করেছিল? এই সময়ে তারা কোন্ কোন্ দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল?

২। লিভিংস্টোন ও স্ট্যান্‌লী কেন আফ্রিকায় গিয়েছিলেন? সেখানে তাঁরা কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন?

৩। কি ভাবে এবং কখন ইউরোপীয় জাতিগুলি নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা বণ্টন করে নিয়েছিল?

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ায় কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতির সাম্রাজ্য ছিল? এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল?

৫। ইউরোপীয় জাতিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম কি হয়েছিল?

দ্বাদশ অধ্যায়

চীন ও জাপানের জাগরণ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীন ও জাপানের সঙ্গে বাইরের জগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের আরম্ভে এই দেশ দুটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ এই সময়ে বিদেশীদের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই ভাবেই কাটে। তারপর প্রায় একই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের শ্বেতাঙ্গ অধি-

বাসীরা জোর করে এই দুটি দেশের বন্ধ-দুয়ার উন্মুক্ত করে আবার এদের বাইরের জগতের কাছে প্রকাশ করে। চীনকে জগতের সম্মুখে তুলে ধরেছিল ইংরাজরা আর জাপানকে আমেরিকানরা। একই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এলেও চীন ও জাপানে এর ফল হয়েছিল বিভিন্ন রকমের। চীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করতে সর্বরকমে অস্বীকার করল। কিন্তু বিদেশীদের আক্রমণ থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারল না। ফলে এই প্রাচীন দেশটি ক্রমেই দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে। জাপানীরা প্রথমে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করে, এবং সর্বরকমে এই সভ্যতাকে গ্রহণ করে শক্তিশালী ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

চীনের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন; অহিফেন যুদ্ধ—ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথম সাগর-পথে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তাদের অনুসরণ করে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও চীনের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে। তারা গুপ্তভাবে ভারতবর্ষ থেকে চীনে আফিং চালান দিত এবং সেই আফিং খেয়ে চীনের অধিবাসীরা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট এই ঘৃণিত ব্যবসা বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। তখন ক্যাণ্টন শহরের একজন কর্মচারী ইংরাজদের অনেকখানি আফিং বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে পরের বছর চীন ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে চীনই হেরে গেল। তখন ইংরাজরা চীন-সম্রাটের কাছ থেকে জোর করে দক্ষিণ চীনের পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার অধিকার আদায় করে নেয়। এছাড়া হংকং দ্বীপেও তাদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ইংরাজদের এই অসামান্য সাফল্য লাভের পর ক্রমে আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিরাও ঐ পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে। প্রায় পনেরো বছর পরে আফিংএর ব্যবসা নিয়েই চীনের সঙ্গে ইংরাজদের আবার একটি যুদ্ধ হয়। এবার ফরাসীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। চীনের আবার পরাজয় হল। এর পরে আরো কয়েকটি বন্দরে বিদেশীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করে। এবার বিদেশীরা চীন-সম্রাটকে তাঁর সভায় বিদেশী দূতদের স্থান দিতেও বাধ্য করল। আরও স্থির হয় যে, চীনের কোন আদালত বিদেশীদের বিচার করতে পারবে না, তাদের বিচার হবে বিদেশীদেরই স্থাপিত এবং পরিচালিত আদালতে এবং বিদেশী বণিক ও ধর্মযাজকেরা চীনের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে পারবে। এই ভাবেই পাশ্চাত্য জাতিরা জোর করে চীনকে বাইরের জগতের কাছে উন্মুক্ত করেছিল।

চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)—ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চাইতেও চীনের বড় শত্রু হয়ে উঠল তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাপান। চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোরিয়া রাজ্য নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। অনেক দিন থেকে কোরিয়ার উপর রাশিয়ার নজর পড়েছিল। কিন্তু এই রাজ্যটির ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, যদি কোন বিদেশী রাষ্ট্র কোরিয়া অধিকার করে তবে জাপানেরও বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী। অথচ কোরিয়াকে বিদেশীদের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখবার মত সামর্থ্য চীনের ছিল না। ক্রমে কোরিয়ার ব্যাপার নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। পাশ্চাত্য সামরিক কায়দায় সুশিক্ষিত জাপানী সৈন্যদের হাতে চীনের বিপুল সৈন্যবাহিনী পরাজিত হ'ল। এই

যুদ্ধের ফলে যে সন্ধি হয় তাতে চীন কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হ'ল। আসলে কিন্তু এই সময় থেকেই কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়াও জাপান চীনের অধিকৃত ফরমোসা ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার ও লিয়াও টাং প্রভৃতি কয়েকটি স্থান অধিকার করল এবং ইউরোপীয়দের মত চীনের কাছ থেকে কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নিল। এদিকে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি দেখে রাশিয়ার মনে ঈর্ষা জাগে। তাই ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে একত্র হয়ে রাশিয়া জাপানকে বাধ্য করল লিয়াও টাং ও পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরিয়ে দিতে। জাপান এ অপমান ভুলতে পারল না।

চীনে বিদেশীদের ভাগ-বাঁটোয়ারা—চীন-জাপানের যুদ্ধের ফলে চীনের সামরিক দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। কাজেই সুযোগ পেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি চীনকে আরও শোষণ করবার ব্যবস্থা করল। তখন সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম চীনে রাশিয়ার, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইংরাজদের, দক্ষিণে ফরাসীদের এবং কিয়াও চাও উপসাগর অঞ্চলে জার্মানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু আমেরিকা দাবী করল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমস্ত চীনই বিদেশী-দের কাছে খোলা রাখতে হবে। আমেরিকানদের এই "খোলা দরজা" (open door) নীতির জন্যই চীনের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল না।

চীনের জাগরণ ও 'বক্সার' বিদ্রোহ (১৯০০)—ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এইরকম স্বেচ্ছাচার ও জাপানের হাতে পরাজয়ের ফলে চীনের জনসাধারণের মনে এবার ধীরে ধীরে জাতীয়তা-বোধ জেগে উঠল। তাদের মধ্যে একদল দেখলেন যে, স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে জাপানের

মত চীনকেও ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আর এক দল বললেন যে, তা নয়, বিদেশীদের তাড়াবার জন্য সকল রকম ভাবে তাদের বর্জন করা উচিত, এমন কি, বিদেশী শিক্ষাও চীনে প্রচলন করা অন্যায় হবে। এই বিদেশী-বিরোধ ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে। এই সময়ে দেশের মধ্যে "মুষ্টিযোদ্ধার দল" (Boxers) নামে একটি গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরা বিদ্রোহী হয়ে বিদেশী বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের দলে দলে হত্যা করতে থাকে। কিন্তু জাপান ও ইউরোপীয় শক্তিগুলি একত্র হয়ে এদের দমন করল।

'বক্সার' বিদ্রোহের বিফলতা দেখে চীনবাসীরা বুঝতে পারল যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। চীনের সম্রাটও তখন এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। দেশের মধ্যে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপিত হল; ছাত্রদের বিদেশ-ভ্রমণ, বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হতে লাগল। ইউরোপের শাসন-পদ্ধতি শিক্ষা করবার জন্য সেখানে কয়েকজন লোককে পাঠান হল এবং দেশে আফিংয়ের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল।



সান-ইয়াৎ সেন

ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন ও ১৯১১ সনের বিপ্লব—চীনে এই সময়ে মাঞ্চুরাজারা রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিদেশী। চীনের উত্তরে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া থেকে তাঁরা এসেছিলেন। চীনের অধিবাসীরা এঁদের বড় ঘৃণা করত। তাই ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক

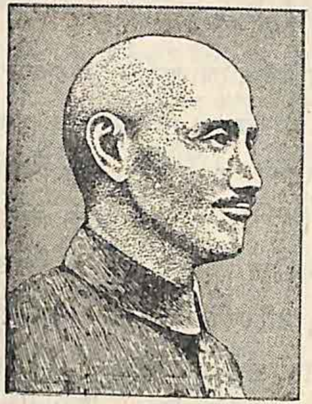
নেতারা রাজবংশকে অপসারিত করে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নানকিং অধিকার করেন। এই বিদ্রোহের ফলে ১৯১১ সনে চীনের শেষ সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন সমস্ত চীনে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সাধারণতন্ত্রী চীনকে নানা রকম আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচার ও জাপানীদের নির্লজ্জ আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশের উন্নতির জন্য ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন অনেক চিন্তা করে তিনটি উপায় নির্দেশ করেছিলেন। প্রথমতঃ বিদেশীদের হাত থেকে দেশের সমস্ত কর্তৃত্ব চীনের লোকেদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে; দ্বিতীয়তঃ চীনে কোনও রাজা রাজত্ব করবেন না, রাজ্যের শাসনভার থাকবে গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে; আর তৃতীয়তঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। ডাঃ সান তাঁর নীতিগুলি সফল করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানের একুশ দফা দাবী—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চীনের অধিবাসীরা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তারা ভেবেছিল যে, যুদ্ধের শেষে হয়ত বা তারা বিদেশী অধিকারভুক্ত প্রদেশগুলি ফিরিয়ে পাবে। কিন্তু এদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন নিজেদের মধ্যে জীবন-মরণের যুদ্ধে ব্যস্ত তখন জাপান অসহায় চীনের কাছে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা চেয়ে একুশ দফা দাবী করে বসল। যুদ্ধ শেষ হবার পর প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিরা জাপানের এই দাবীর একটি প্রতিকার চেয়েছিল; আর সেই সঙ্গে বিদেশী স্বেচ্ছাচারিতা যাতে চীনে অবাধে চলতে না পারে তারও দাবী

তাঁরা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও রকম সুবিধাই চীনকে দেওয়া হ'ল না।

গৃহযুদ্ধ—সান-ইয়াৎ সেন যে সাধারণতন্ত্রী দল গঠন করেছিলেন, তার নাম কুও-মিং-টাং। তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং কাই শেক দলের নেতা হন। কিন্তু কিছুকাল পরে এই দলের জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী শাখার মধ্যে নানা রকম বিরোধিতা দেখা দিতে লাগল। শেষে সাম্যবাদীরা কুও-মিং-টাং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই নূতন দলটি অল্প সময়ের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমে এই দলটির সঙ্গে চিয়াং পরিচালিত কুও-মিং-টাং দলের সঙ্ঘর্ষ দেখা দিল।



চিয়াং কাই শেক

জাপানের চীন আক্রমণ—এই গৃহযুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৩১ সালে জাপান উত্তর চীন আক্রমণ করে মাঞ্চুরিয়াতে অধিকার বিস্তার করে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের সব লোকই বুঝতে পারল যে, চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে তাদের একত্রিত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তাই জাপানকে প্রতিরোধ করবার জন্য বিভিন্ন দলগুলি নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে গিয়ে চিয়াং কাই শেকের অধীনে এসে মিলিত হয়। কিন্তু সমগ্র চীনের সম্মিলিত শক্তিও জাপানকে প্রতিরোধ করতে পারল না। একে একে জাপান চীনের বড় বড় শহর ও প্রদেশগুলি দখল করে নিতে লাগল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে, তখন

চীনও তার বিরুদ্ধ পক্ষ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়। এই ভাবে চীন-জাপানের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি অঙ্গ হয়ে ওঠে।

জাপানের অভ্যুদয়—চীনাদের মত জাপানীরাও মোঙ্গল জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের সভ্যতা, লেখমালা, সাহিত্য—সব কিছুই চীনাদের কাছ থেকে নেওয়া। অতি প্রাচীন কালে জাপানে একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে মধ্য যুগের ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থার কতকটা মিল দেখা যায়। দেশের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদার ছিলেন। তাঁরা নিজেদের এলাকার মধ্যে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন, তাদের শাসন করতেন,—প্রজাদের রক্ষার ভারও তাঁদের উপর ছিল। এই কাজের জন্য এঁরা কিছু কিছু সৈন্যসামন্ত রাখতেন। এই সব জমিদারদের বলা হত **ডাইমিও**। জমিদার শ্রেণী ছাড়াও জাপানে আরেক দল শক্তিশালী এবং সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তাদের বলা হত **সামুরাই**।


সামুরাই

প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে একজন সম্রাট ছিলেন। এঁর উপাধি **মিকাডো**। জাপানীরা মনে করে যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ইক্ষাকু বংশের মত তাদের সম্রাটবংশও সূর্যদেবের সন্তান। এই বংশই আজ পর্যন্ত রাজত্ব করছে। জাপানীরা তাই তাদের সম্রাটকে দেবতার মত সম্মান করে।

প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকে জাপানের বিভিন্ন নামজাদা বংশের 'শোগান' বা 'মহাসেনানায়ক' উপাধিধারী নায়কগণ দেশ

শাসন করতেন, সম্রাটের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে গৃহবিবাদ হলেও শোগানদের অধীনে জাপানে মোটামুটি শান্তি ও সুনিয়ম স্থাপিত হয়েছিল।

ইউরোপীয়দের আগমন—চীনের মত জাপানের সঙ্গেও ইউরোপীয়দের সর্বপ্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। এখানেও পর্তুগীজরাই এই সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ছিল। জাপানীরা ইউরোপীয়দের প্রথমে সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু এরা যখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করল তখন জাপানীদের মনে এদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জেগে ওঠে। তখন জাপানীরা ইউরোপীয়দের শুধু তাড়িয়েই দিল না, তারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে জাপানের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিল। এই ভাবে জাপান দুশো বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল।

কমোডোর পেরী—উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাপানের বন্ধ দরজা আবার পৃথিবীর অন্য দেশের কাছে উন্মুক্ত হয়। কমোডোর পেরী নামে একজন আমেরিকান নৌ-সেনাপতি কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে জাপানে এসে উপস্থিত হন এবং এই দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য অনুমতি দাবী করেন। যুদ্ধ-জাহাজ সঙ্গে থাকাতে জাপান পেরীর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয় আমেরিকানদের অনুসরণ করে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরাও জাপানে এসে উপস্থিত হ'ল। জাপানীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এদের কলহ এবং সজ্ঘর্ষ চলতে থাকল। কিন্তু তারা এইসব বিদেশীদের প্রতিরোধ করতে পারল না।

নবযুগের সূচনা: সম্রাটের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শাসন-সংস্কার—তখন জাপানীরা বুঝতে পারল যে, এইসব অনাহূত বিদেশীদের দলকে তাড়াতে হবে তাদেরই অস্ত্র দিয়ে। স্বাধীনতা

রক্ষার জন্য জাপান মনে প্রাণে পশ্চিমের সভ্যতাকে গ্রহণ করল। ডাইমিও, সামুরাই ও শোগানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দিয়ে মিকাডোর হাতে আবার দেশ শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। দেশে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে সেখানে ইউরোপীয় রীতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। সব চেয়ে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটল সামরিক শিক্ষাদানে এবং শিল্প ও কারখানাতে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে ছোট বেলা থেকেই প্রত্যেকটি জাপানী শিশুকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলা হ'ল। দেশের সমস্ত জায়গাতে কল-কারখানা, রেল লাইন, টেলিগ্রাফ, বন্দর, ডক প্রভৃতি তৈরী করা হতে লাগল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে শিল্প এবং সামরিক শক্তিতে জাপান যে কোনো ইউরোপীয় শক্তির সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াল। এইভাবে যে পরিবর্তন আনতে ইউরোপের একশ বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল, জাপান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে সেই যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে জাপানের নবজন্ম আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪)—ইউরোপের কাছ থেকে জাপান যে শুধু সামরিক, বৈজ্ঞানিক বা শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞানই লাভ করল তা নয়, পশ্চিমের সাম্রাজ্য লিপ্সাকেও সে এই সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে সে এবার নিজের অধিকার বিস্তার করতে প্রস্তুত হ'ল এবং চীনকে পরাজিত করে কোরিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত করল। জাপানের বিস্ময়কর জয়লাভে পশ্চিমের সমস্ত শক্তিগুলিই আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন থেকে তারা জাপানের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার মেনে নেয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪)—চীন-জাপনের যুদ্ধের দশ বৎসর পরে মাঞ্চুরিয়ার আধিপত্য নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সঙ্ঘর্ষ বাধে। কোরিয়ার মত মাঞ্চুরিয়ারও ভৌগোলিক অবস্থান এমন গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়া বা জাপান যে পক্ষই তার উপর আধিপত্য করুক না কেন অপর পক্ষের তাতে বিপদ্‌গ্রস্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী; কারণ প্রতিপক্ষ যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। আমরা এর আগে দেখেছি যে, রাশিয়া বাধা দেবার ফলেই জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর ও লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই রাশিয়া যখন মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ দখল করে সেখানকার তুটি বন্দরের উপরে অধিকার স্থাপন করল, তখন তুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখিয়ে জাপান রাশিয়াকে জল এবং স্থলে পরাজিত করে। এতে সর্বত্র তার সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং তাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বিশ্বযুদ্ধে জাপান—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান সহজেই চীনদেশে জার্মানীর অধিকৃত কিয়াওচাও প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে চীনের উপর সে যে একুশ দফা দাবী করেছিল তারও কিছুটা আদায় করে নেয়। এর ফলে চীনের উপর জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার প্রায় তিন বছর পরে ওয়াশিংটনে বড় বড় শক্তিগুলির একটি সম্মেলন হয়েছিল। তখন অন্যান্য শক্তিগুলির চাপে জাপানকে কিয়াওচাও প্রদেশ আবার চীনকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এই ভাবে জাপানের ক্রমবর্ধমান শক্তি কিছু খর্ব হয়। এরপর কয়েক বছর জাপানীরা চীনের উপর আর কোন উপদ্রব

করেনি। কিন্তু ১৯৩১ সালে আবার হঠাৎ তারা চীনকে আক্রমণ করে এবং মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিয়ে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা সমস্ত চীন দেশই জয় করবার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে এইজন্য চীনের সঙ্গে জাপানের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধই অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায়।

জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা ছিল অসীম। হঠাৎ শক্তিবৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে সমস্ত প্রাচ্য জগতের অধিপতি হতে চেয়েছিল। এইজন্যই সে বার বার চীন জয়ের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জাপানের একটি বিষয়ে ভুল হ'ল। বার বার বিদেশীদের আক্রমণের ফলে চীনের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। তাই জাপানের নিষ্ঠুর আক্রমণ চীনাদের প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জাপানের নিজেরই পতন হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৪০-৪২—প্রথম অহিফেন যুদ্ধ
১৮৫৪—কমোডোর পেরীর জাপানে আগমন
১৮৬৭—মিকাডোর ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা
১৮৯৪-৯৫—চীন-জাপানের যুদ্ধ; চীনের পরাজয়
১৯০০—'বক্সার' বিদ্রোহ
১৯০৪-৫—রুশ-জাপান যুদ্ধ; রাশিয়ার পরাজয়
১৯১১—চীনে সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব; মাঞ্চু রাজবংশের পতন
১৯২৭—চিয়াং-কাই-শেকের অভ্যুত্থান
১৯৩১—জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪)—চীন-জাপনের যুদ্ধের দশ বৎসর পরে মাঞ্চুরিয়ার আধিপত্য নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সঙ্ঘর্ষ বাধে। কোরিয়ার মত মাঞ্চুরিয়ারও ভৌগোলিক অবস্থান এমন গুরুত্বপূর্ণ যে রাশিয়া বা জাপান যে পক্ষই তার উপর আধিপত্য করুক না কেন অপর পক্ষের তাতে বিপদ্‌গ্রস্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী; কারণ প্রতিপক্ষ যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। আমরা এর আগে দেখেছি যে, রাশিয়া বাধা দেবার ফলেই জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর ও লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই রাশিয়া যখন মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ দখল করে সেখানকার দুটি বন্দরের উপরে অধিকার স্থাপন করল, তখন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখিয়ে জাপান রাশিয়াকে জল এবং স্থলে পরাজিত করে। এতে সর্বত্র তার সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং তাকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বিশ্বযুদ্ধে জাপান—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান সহজেই চীনদেশে জার্মানীর অধিকৃত কিয়াওচাও প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে চীনের উপর সে যে একুশ দফা দাবী করেছিল তারও কিছুটা আদায় করে নেয়। এর ফলে চীনের উপর জাপানের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার প্রায় তিন বছর পরে ওয়াশিংটনে বড় বড় শক্তিগুলির একটি সম্মেলন হয়েছিল। তখন অন্যান্য শক্তিগুলির চাপে জাপানকে কিয়াওচাও প্রদেশ আবার চীনকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এই ভাবে জাপানের ক্রমবর্ধমান শক্তি কিছু খর্ব হয়। এরপর কয়েক বছর জাপানীরা চীনের উপর আর কোন উপদ্রব

করেনি। কিন্তু ১৯৩১ সালে আবার হঠাৎ তারা চীনকে আক্রমণ করে এবং মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিয়ে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা সমস্ত চীন দেশই জয় করবার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে এইজন্য চীনের সঙ্গে জাপানের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধই অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায়।

জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা ছিল অসীম। হঠাৎ শক্তিবৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে সমস্ত প্রাচ্য জগতের অধিপতি হতে চেয়েছিল। এইজন্যই সে বার বার চীন জয়ের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জাপানের একটি বিষয়ে ভুল হ'ল। বার বার বিদেশীদের আক্রমণের ফলে চীনের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। তাই জাপানের নিষ্ঠুর আক্রমণ চীনাদের প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জাপানের নিজেরই পতন হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৪০-৪২—প্রথম অহিফেন যুদ্ধ

১৮৫৪—কমোডোর পেরীর জাপানে আগমন

১৮৬৭—মিকাডোর ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

১৮৯৪-৯৫—চীন-জাপানের যুদ্ধ; চীনের পরাজয়

১৯০০—'বক্সার' বিদ্রোহ

১৯০৪-৫—রুশ-জাপান যুদ্ধ; রাশিয়ার পরাজয়

১৯১১—চীনে সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব ; মাঞ্চু রাজবংশের পতন

১৯২৭—চিয়াং-কাই-শেকের অভ্যুত্থান

১৯৩১—জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ

অনুশীলনী

১। কি ভাবে ইউরোপীয়রা চীনের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করেছিল ? চীনের কোন্ কোন্ স্থানে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

২। চীন-জাপানের যুদ্ধ কেন হয়েছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?

৩। 'বক্সার' বিদ্রোহ কেন হয়েছিল ? এর বিফলতায় চীনের অভ্যন্তরে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ?

৪। কি ভাবে চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ? এই সময়ে সাধারণতন্ত্রী দলের নেতা কে ছিলেন ? তিনি কি উপায়ে চীনের উন্নতি করবার চেষ্টা করেছিলেন ? তাঁর মৃত্যুর পরে চীনের কিরূপ অবস্থা হয়েছিল ?

৫। কিভাবে জাপানে ইউরোপীয়রা প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছিল ? জাপানীদের উপর এর কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ? কিভাবে জাপান পৃথিবীর একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল ?

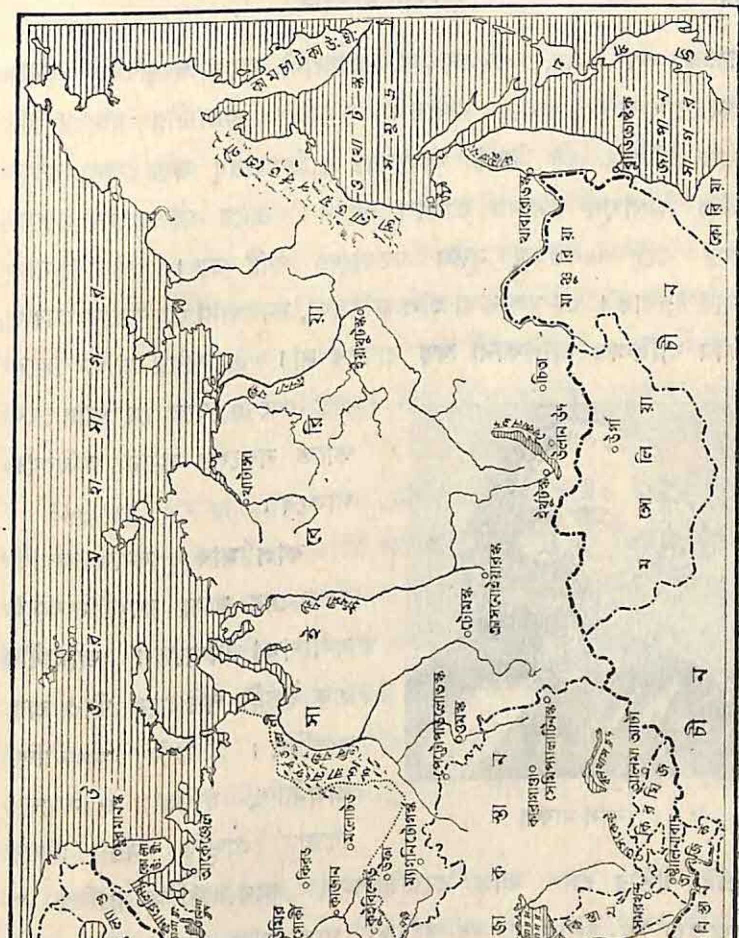
৬। কেন রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সজ্ঘর্ষ হয়েছিল ? এই সজ্ঘর্ষের কি ফল হয়েছিল ?

৭। কিভাবে জাপান ধীরে ধীরে চীনদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ? এর পরিণাম কি হয়েছে ?

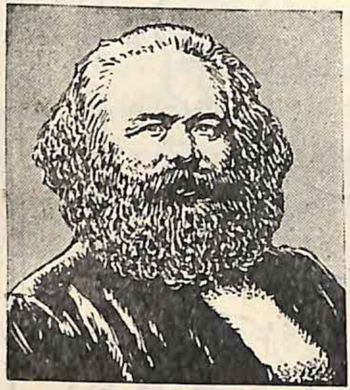
ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

সমাজতন্ত্রবাদ—১৯১৭ সনে রাশিয়াতে একটি খুব বড় বিপ্লব হয়। এর ফল ফরাসী বিপ্লবের চেয়েও অধিক সুদূরপ্রসারী হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সমাজে তুইটি অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। একদল ধনিক সমস্ত রকম জমিজমা, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির মালিক ;


রাশিয়া
রাজনৈতিক

আরেক দল গরীব, জমিজমাহীন, শ্রমজীবী মজুর ও কৃষক,—সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী সমাজ জীবনে এই বিরাট পার্থক্যের প্রতিকারের জন্য নানা রকম গভীর চিন্তাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন। ক্রমে এইসব মতবাদকে কেন্দ্র করে একরকম নূতন মতবাদের সৃষ্টি হয়। তার নাম সমাজতন্ত্রবাদ। এর মূল কথা হ'ল জমিজমা, কারখানা প্রভৃতিতে কারও কোন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকবে না। এ সবের মালিক হবে রাষ্ট্র এবং এ থেকে যে আয় হবে তাতে সকলের সমান অধিকার থাকবে।



কার্ল মার্কস্

কার্ল মার্কস্—সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মধ্যে কার্ল মার্কস্ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দুঃখ-জর্জরিত শ্রমিক ও কৃষকেরা কি উপায়ে তাদের দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে তাই উদ্ভাবন করবার জন্য তিনি জীবনপাত করে গেছেন। তাঁর মতামত ব্যক্ত করে তিনি অনেক বই লিখেছিলেন। এর মধ্যে সাম্যবাদের ইস্তাহার (Communist Manifesto) ও দাস্ ক্যাপিটাল (Das Capital)ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। মার্কস্ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, বর্তমান সমাজ,—যে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিক, জমিদার ও কারখানার মালিক প্রভৃতিই

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী—সেই সমাজের একদিন পতন হবে। সেই জায়গায় শ্রমজীবী মজুর ও কৃষকেরা শক্তিশালী হয়ে সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তখন ক্রমে শ্রেণীগত পার্থক্য দূর হয়ে যাবে, এবং দেশের সমস্ত ধন ও ধন-উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মালিক হবে দেশবাসী সমস্ত লোক। মার্কস্‌কে এইরকম চরমপন্থী মতবাদের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। এইজন্য তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই লণ্ডনে অতিবাহিত হয়েছিল। রুশ বিপ্লবে যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা মার্কসের মতবাদকেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সার্থক করবার চেষ্টা করেছেন।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশ জাতি অনেক বিষয়ে অনুন্নত ছিল। মধ্য-যুগের জমিদারদের মত তখন রাশিয়ার অভিজাত বংশের লোকেরা রাজ-নৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন। এঁদের সকলের উপরে ছিলেন সমগ্র রাশিয়ার সম্রাট। তাঁর উপাধি ছিল "জার" (Tsar)। রাজবংশের ও অভিজাতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও গুপ্ত-পুলিসের সাহায্যে যথেচ্ছ রাজ্য শাসন করতেন।

রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কৃষক। তারা ছিল অত্যন্ত গরীব এবং অশিক্ষিত। শিল্প উৎপাদনেও রুশরা বিশেষ অগ্রণী ছিল না। দেশে যা কিছু শিল্প উৎপাদন করা হত তার মূলধন যোগাত বিদেশী ধনিকেরা। কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা কৃষকদের মতই ছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তারা বাস করত এবং সামান্য মজুরী দিয়ে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হত। কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির প্রতি শাসকদের কোন রকম দৃষ্টি ছিল না।

শাসন-সংস্কারের আন্দোলন—টলষ্টয় প্রভৃতি রাশিয়ার কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের দুরবস্থা এবং জারের স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমে রাশিয়ার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে কতকগুলি উদারপন্থী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। এরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করে। দুটি সমাজতান্ত্রিক দলও গঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে একদল ছিল মার্কসের মতবাদী। তাদের নাম **বলশেভিক**। এরাই পরে কমিউনিস্ট অর্থাৎ সাম্যবাদী বলে পরিচিত হয়। এদের নেতা ছিলেন **লেনিন**। তিনি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক কাল আন্দোলনের ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার করা হয়। কিন্তু এতে জারের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না।



লেনিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়— ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাশিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু রুশ সৈন্যদলের না ছিল ভাল অস্ত্রশস্ত্র, না ছিল পর্যাপ্ত রসদের ব্যবস্থা। এইজন্য তাদের ভীষণভাবে পরাজয় হতে থাকে। যুদ্ধের এই রকম শোচনীয় অসাফল্য এবং খাদ্যের অভাবের জন্য দেশে ভয়ানক অশান্তি দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা ও শহরে শ্রমিকেরা সর্বত্র দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি

করল। যে সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে জার তাঁর শাসনকার্য চালাতেন তারাও খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে দলে দলে এসে দাঙ্গাকারী-দের সঙ্গে যোগ দিল। জারের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব হওয়াতে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লব শুরু হ'ল।

বলশেভিকদের ক্ষমতা লাভ—এবার স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের পরি-বর্তে একটি উদারপন্থী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। তখন দেশের নেতা হলেন কেরেন্‌স্‌কি। এদিকে রাজধানী পেট্রোগ্রাদ (এখনকার লেনিনগ্রাদ) এবং অন্যান্য শহরের শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে স্থানীয় পরিষদ (সোভিয়েৎ) গঠন করেছিল। এই সব পরিষদে বলশেভিকরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা শান্তিস্থাপন, জমিজমার পুনর্বণ্টন ও খাদ্য সরবরাহের জন্য আন্দোলন শুরু করল। কিন্তু নূতন শাসকেরা দেশের জনসাধারণের এই দাবী পূরণ করতে অসমর্থ হলেন। কাজেই তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

দেশ জুড়ে যখন এই রকম একটা বিরাট অশান্তিময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তখন জার্মান সেনাবাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে পেট্রোগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হ'ল। এই নূতন পরাজয়ের ফলে এবার দেশময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই সময়ে লেনিন দেশে ফিরে এসে তাঁর দুই সহযোগী **ট্রটস্কী** ও **ষ্ট্যালিনের** সাহায্যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করেন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর এই বিপ্লব হয়েছিল বলে এই দিনটিকে রুশেরা বিপ্লব-দিবস বলে পালন করে।

বলশেভিকদের বিপদ—ক্ষমতা লাভের পর লেনিন আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতির দিকে মন দেন। তিনি প্রথমেই জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। এর পরে তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী রাশিয়াকে

নূতনভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন। এইভাবে এখনকার সংযুক্ত সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সৃষ্টি হয়। নূতন রাশিয়াকে এই সময়ে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার বলশেভিক গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করতে চাইল না। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাও বলশেভিকদের উচ্ছেদ করবার জন্য বিদেশী কয়েকটি দেশের সহায়তায় যুদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু ট্রটস্কীর নেতৃত্বে পরিচালিত 'লালফৌজের' সামনে এরা কেউই দাঁড়াতে পারল না। এর মধ্যেই জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল—যাতে জারবংশের কোন লোক এসে কোন দিন আর রাশিয়ার সিংহাসন দাবী করতে না পারেন। এইভাবে বলশেভিকেরা রাশিয়াকে সমস্ত রকম বিপদ থেকে মুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠিত করে।

নূতন রাশিয়ার সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে যে নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাতে সকল রকম শ্রেণীবৈষম্য লোপ করবার চেষ্টা চলছে। জমিদার এবং ধনিক শিল্পপতিদের কাছ থেকে জমি ও কলকারখানার মালিকানা-স্বত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সোভিয়েৎ রাষ্ট্রই এসব জমিজমা এবং শিল্প ও কারখানাগুলির মালিক। প্রত্যেক কৃষককেও তার নিজস্ব জমিজমা ছেড়ে দেবার জন্য রাজী করানো হয়েছে। তাদের ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রগুলি একত্র করে বড় বড় কৃষিক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। গ্রামের সকলেরই এতে চাষ-আবাদ করবার অধিকার আছে। তারা রাষ্ট্রের দেওয়া আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই সব জমিজমা চাষ করে। সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করবার জন্যও নানা রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী ষ্ট্যালিন রাশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন। কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দ্বারা তিনি রাশিয়ার অর্থ নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছেন। দেশের প্রায় সর্বত্র বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য যন্ত্রগৃহ এবং বহু আধুনিক কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং বহুদূর-বিস্তৃত বিরাট কৃষিক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের ফলে রাশিয়ার ধনসম্পত্তি আজ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর সহকর্মী নিকিতা ক্রুশ্চেভ সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। তিনি দেশের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাঁর সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা মহাকাশের রহস্য উদঘাটনের জন্য অসীম শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে মনুষ্য-প্রেরণ। মেজর গাগারিন নামে এক অসাধারণ সাহসী যুবক সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। সম্প্রতি ক্রুশ্চেভ পদত্যাগ করায় কোসিজিন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

শাসন-পদ্ধতি—বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে কৃষক মজুর প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই সব প্রতিনিধিসভার নাম সোবিয়েৎ। শহর ও গ্রামের সোবিয়েতের সদস্যরা আবার জেলার সোবিয়েতের সদস্যদের নির্বাচিত করে। এইভাবে ক্রমে সকলের উপরের নিখিল রুশীয় সোবিয়েৎ সম্মেলনীর সদস্যগণ নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্য থেকে দেশের শাসকবর্গকে মনোনীত করা হয়। এইভাবে পরোক্ষে কৃষক ও মজুরদের প্রতিনিধিরাই

এখন রাশিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার এখনও দেওয়া হয়নি। যারা কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী একমাত্র তারাই দল গঠন করতে পারে। দেশ শাসন করবার অধিকারও একমাত্র এদেরই আছে। এখন এইভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারা মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য এক নূতন রকমের পরীক্ষা করে চলছেন। এর প্রভাব আজ প্রায় পৃথিবীর সব দেশে দেখা দিয়েছে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৯১৭—রুশ বিপ্লবের আরম্ভ

" ৭ই নভেম্বর—বলশেভিকদের ক্ষমতা লাভ

অনুশীলনী

১। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝা যায়? সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত? তিনি কি মতবাদ প্রচার করেছিলেন?

২। কি উদ্দেশ্য নিয়ে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল? এর ফলে রাশিয়ার সমাজ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের কি রকম পরিবর্তন হয়েছে?

চতুর্দশ অধ্যায়

বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দুটি খুব বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র এতে কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করেছিল বলে এই যুদ্ধ দুটিকে বিশ্বযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিহাসে এর আগেও আমরা আরও অনেক যুদ্ধের বর্ণনা পাই। কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধ দুটির ফলে মানুষকে যে রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, এবং সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসকে এই যুদ্ধ দুটি যে রকম গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে রকম কখনও দেখা যায় নি।

বিশ্বযুদ্ধের কারণ—প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটি বিশ্বযুদ্ধই সর্বপ্রথম ঘোষণা করে জার্মানী। কিন্তু শুধু জার্মানীকে এজন্য দায়ী করা যায় না। ইউরোপের অন্যান্য বড় বড় শক্তিগুলিরও এতে কিছু না কিছু দায়িত্ব ছিল। এই যুদ্ধ দুটির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ফলে ইউরোপের দেশগুলি নিজ নিজ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এইজন্য বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলি অন্যান্য দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করে। আবার অন্য দিকে ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতি অন্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বজাতীয়দের একত্রিত করে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল, তাতেও প্রায়ই বিরোধের উৎপত্তি হত। আসলে এই সব কারণেই এঁদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেধেছিল।

জার্মানীর শক্তি-সঞ্চয়—বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবার পর জার্মানী ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। তার এই উন্নতির মূলে আমরা একাধিক কারণ দেখতে পাই। জার্মানী পূর্বে ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু আধুনিক যুগের উন্নততর বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে নিজের দেশের শিল্পগুলির প্রভূত উন্নতি করে। দেশে অগণিত কল-কারখানার সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানী খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। সামরিক শক্তিতেও জার্মানী ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বহু রণাঙ্গনে একাধিক বার যুদ্ধে জয়লাভ করে জার্মানরা তা প্রমাণ করেছিল।

এদিকে বিসমার্ক ইউরোপে জার্মানীর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করবার পর, সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীকে আরও বেশী শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। জার্মানীকে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। এইজন্য তিনি সৈন্যবল ছাড়া জার্মানীর নৌবলও বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল জলপথে আধিপত্য স্থাপন করে সমুদ্র-পারেও সাম্রাজ্য বিস্তার করা।


দ্বিতীয় উইলিয়াম

জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধ এবং উভয়পক্ষে রণসজ্জা—জার্মানীর এইরকম দ্রুত শক্তিবিকাশ দেখে ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তিগুলি শঙ্কিত হয়ে উঠল। এতদিন শিল্প-বাণিজ্য, সাম্রাজ্য স্থাপন এবং নৌশক্তিতে ইংল্যাণ্ডই ছিল ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। এই তিনটি ক্ষেত্রেই জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে আঘাত লাগে এবং এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ বেধে ওঠে। তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হওয়ায় ফ্রান্সও জার্মানীর উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এ ছাড়া ফরাসীরা জার্মানীর দিক থেকে পুনরাক্রমণের ভয়েও ভীত ছিল। পূর্ব ইউরোপে বল্কান উপদ্বীপে জার্মান প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গেও জার্মানীর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়।

ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলি ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদলে ছিল জার্মান-বিরোধী ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। এরা পরে মিত্রশক্তি বলে পরিচিত হয়। অন্য দলে ছিল জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। এদের বলা হত কেন্দ্রীয় শক্তি। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাধার ফলে দুদলই ক্রমে বুঝতে পারে যে যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই তারা বছরের পর বছর ধরে গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক, যুদ্ধ-জাহাজ এবং অন্য নানা রকম যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বাড়াতে থাকে। ফলে যুদ্ধের আশঙ্কাও ক্রমে নিকটতর হতে থাকে।

অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যা ও যুদ্ধারম্ভ—প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল একটি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে। তখন ইউরোপের পূর্ব অঞ্চলে সার্ভিয়া নামে একটি ছোট দেশ ছিল। কিন্তু বহু সার্ভ অস্ট্রিয়ার অধীন ছিল। তারা সার্ভিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। এজন্য তাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৩ সালের ২৮শে জুন একজন

বিপ্লবী সার্ভ সারাজেভো নামে এক শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তাঁর পত্নীকে গুলি করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং কতকগুলি শর্ত অবিলম্বে পূরণের দাবী জানিয়ে সার্ভিয়ার নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করল। কিন্তু এই পত্রের সমস্ত দাবী সার্ভিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়া সার্ভিয়া আক্রমণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল।

দুইপক্ষ ও তাদের মিত্র—অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত ক্ষমতা সার্ভিয়ার ছিল না। তাই তারা রাশিয়ার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। রাশিয়া তখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। অস্ট্রিয়াকে বিপন্ন দেখে জার্মানী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তখন পূর্ব চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স এসে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। এর পরে জার্মানবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্স এবং রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চার বছর ধরে চলেছিল। ক্রমে একে একে বিশ্বের সমস্ত প্রধান শক্তিগুলিই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার অনেক দিন ধরে ঝগড়া ছিল বলে সুযোগ বুঝে সে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এদিকে ইটালী, জাপান এবং শেষের দিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মিত্রপক্ষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করে।

অতীতের যুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের পার্থক্য—অতীতের যে সব যুদ্ধের কথা আমরা ইতিহাসে পড়ি তার সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের অনেক পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড়

শক্তিগুলিই এতে যোগ দিয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম আর কখনও ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই যুদ্ধ অনেক বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে অনেক রকম নূতন অস্ত্রশস্ত্র সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়; যেমন ভারী বন্দুক, দূরপাল্লার কামান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজ, এরোপ্লেন, বিষাক্ত গ্যাস। এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সব জায়গাতেই উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা চলেছিল। মাটিতে খাদ (trench) কেটে তার ভিতরে আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালাবার রীতিও এই সময়ে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। দূরপাল্লার কামান থেকে গোলানিক্ষেপ এবং আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের ফলে শুধু যে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদেরই প্রাণহানি হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু নিরপরাধ বেসামরিক লোককেও প্রাণ হারাতে হয়েছিল এবং বহু সমৃদ্ধিশালী শহর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আবার ডুবো-জাহাজের আক্রমণে অসংখ্য নৌ-সৈন্যের সলিল সমাধি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় তিন কোটি লোক আহত ও নব্বই লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। কেবল ফ্রান্সেই একুশ হাজার কারখানা, ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার ঘরবাড়ী এবং এক হাজার ছশো ঊনষাটটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়।

যুদ্ধের অবসান ও ভার্সাইয়ের সন্ধি—চার বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করবার ফলে জার্মানীর শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। তার মিত্রপক্ষীয় জাতিগুলিও পরাজিত হয়ে একে একে যুদ্ধ থেকে অবসর নেয়। জার্মানরা যখন বুঝতে পারল যে জয়ের কোন আশা নেই, বিরুদ্ধ পক্ষ তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, তখন তারা ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করল। এই দিনটি এখনও যুদ্ধবিরতি দিবস বলে পালন করা হয়। এর পরে

ভার্সাই শহরে অনেকগুলি বৈঠক ও সভাসমিতির অধিবেশনের পর বিজয়ী ও পরাজিত শক্তিগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ভার্সাইয়ের সন্ধিতে ইউরোপের মানচিত্রকে আবার নূতন করে আঁকা হয়েছিল। প্রত্যেক জাতির লোকদের পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবার অধিকার আছে—এই মহান নীতিকে এই সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন জাতি বাস করত। তাই এই বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ভেঙে দিয়ে হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হ'ল। কিন্তু এই নীতি সর্বত্রই সমান ভাবে অনুসরণ করা হয় নি বলে যুদ্ধের পরে অনেক নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল।

ভার্সাইর সন্ধির সময়ে যুদ্ধের জন্য একমাত্র জার্মানীকেই বিশেষ ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং এই জন্য তাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। যুদ্ধের শর্ত অনুসারে জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশগুলি কেড়ে নিয়ে বিজয়ী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। ইউরোপেও জার্মানীর আয়তন অনেক ছোট করে দেওয়া হ'ল। এ ছাড়াও জার্মানী বিজয়ীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ করতে স্বীকার করে। ভার্সাইর সন্ধির সময়ে জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল সে তা কোনও দিন ভুলতে পারে নি। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে উৎসুক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার এও একটি প্রধান কারণ।

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে সকলেই যুদ্ধবিগ্রহের অপকারিতা বুঝতে পারেন। সেইজন্য ভার্সাইর সন্ধির সময়ে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলসন এই সঙ্ঘটি গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করেছিলেন। সুইজার-

ল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা শহরে এই জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন হত। সমস্ত জাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সহৃদয়তা ও সহযোগিতা বজায় রেখে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবে এই ছিল জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে বিজয়ী এবং নিরপেক্ষ কতকগুলি রাষ্ট্র প্রথমে এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল। পরে পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকেও সভ্য হবার অনুমতি দেওয়া হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সঙ্ঘে যোগ দিল না। পরে মতের অমিল হওয়ায় জাপান, ইটালী এবং সর্বশেষে জার্মানী জাতিসঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে বিবাদ কলহ প্রভৃতি মেটাবার জন্য একটি **আন্তর্জাতিক বিচার-সভারও (World Court)** প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ (The Hague) নামক জায়গায় এর অধিবেশন এখনও হয়। জাতিসঙ্ঘ অনেকগুলি ছোটখাট আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ মেটাতে পেরেছিল। কিন্তু সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হতে পারেনি। তার কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগলেই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সঙ্ঘের নীতি মানতে অস্বীকার করত। তাদের উপর জাতিসঙ্ঘ কোনও রকম জোরই খাটাতে পারত না। জাপান যখন চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অন্যায়ভাবে অধিকার করল আর ইটালী আক্রমণ করল আবিসিনিয়াকে, তখন জাতিসঙ্ঘ এদের কাউকেই রোধ করতে পারেনি। এই কারণে জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা অনেক কমে গেল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এর বিলোপ ঘটল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের সমস্যা ঃ মুসোলিনির উত্থান—ভার্সাইর সন্ধির সময়ে ইউরোপের মানচিত্র যেভাবে পরিবর্তন করা হয়েছিল তাতে সকলে সন্তুষ্ট হ'ল না। তা ছাড়া যুদ্ধের ফলে

ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই সাধারণ লোকদের অতি দুরবস্থা হয়েছিল। এজন্য যে সব নেতা তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার কথা বলতেন এরা তাঁদেই অনুসরণ করত। ইটালীতে এই সময়ে বেনিতো মুসোলিনি নামে একজন বিখ্যাত জননেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি যুদ্ধ-ফেরত দুর্দশাগ্রস্ত সৈনিকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করেন। এদের বলা হত ফ্যাসিষ্ট (Fascist)।

১৯২২ সালে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্ট দল এককম জোর করে ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করে। এর পরে সমস্ত বিরুদ্ধ দল-গুলিকে ধ্বংস করে মুসোলিনি ইটালীর সর্বেসর্বা (Dictator) হয়ে ওঠেন। তিনি ইটালীর অনেক উন্নতি করে-ছিলেন। দেশের নানা জায়গায় রাস্তাঘাট তৈরী হ'ল, জলাভূমি পরিষ্কার করে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হ'ল; লোকের দুঃখ-দুর্দশাও অনেকটা দূর হ'ল। কিন্তু মুসোলিনির সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব বেশী। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি একটি সেনাদল গঠন করলেন। এদের সাহায্যে তিনি অন্যায়ভাবে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে আরও দেশ জয় করবার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মানীর পক্ষে যোগদান করেন। কিন্তু এতে তিনি নিজের এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন।



মুসোলিনি

হিটলারের অভ্যুত্থান—যুদ্ধের পর জার্মানীতেও অসন্তোষ জমে উঠেছিল। ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলি প্রত্যেকটি জার্মানের

মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এর সুযোগ নিয়ে মুসোলিনির মত অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার নামে একজন শক্তিমান নেতা জার্মান রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হস্তগত করেন। ইনিও যুদ্ধ-ফেরত জার্মান সৈন্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। এদের বলা হত জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীদল (National Socialist Party)। এই দলটি সংক্ষেপে নাৎসী নামে পরিচিত হয়। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষমতা লাভ করে হিটলার জার্মানীর পুনর্গঠনের দিকে মন দেন। দেশের শিল্পগুলির বিশেষ উন্নতি করা হ'ল, এবং আরও অনেক জনহিতকর কার্য এই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু জার্মানীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মুসোলিনির মত হিটলারও সৈন্যগঠনের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি ইটালী ও জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এইভাবে পৃথিবীতে আবার একটা বিরাট যুদ্ধের আভাস ঘনিয়ে আসে।

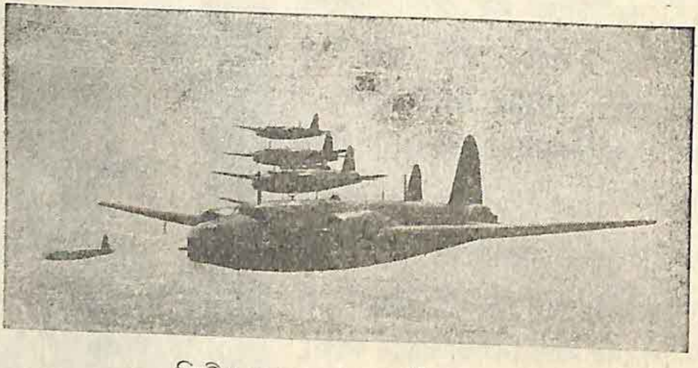


হিটলার

হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি—দেশকে সব বিষয়ে শক্তিশালী করবার পর হিটলার দাবী করলেন যে, জার্মানীর বাইরে যে সব অঞ্চলে জার্মানদের বাস সেগুলি জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হবে। এই অজুহাতে হিটলার একরকম বিনা বাধায় অস্ট্রিয়া অধিকার করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশও তিনি দখল করে নিলেন। কিন্তু এতেও তাঁর সন্তুষ্টি হ'ল না। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ল গিয়ে পোল্যাণ্ডের দিকে।

এদিকে হিটলারের অগ্রগতিতে রাশিয়া শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া মিত্রতা স্থাপন করতে চাইলে তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই জার্মানী যখন পরস্পরকে আক্রমণ করবে না বলে চুক্তি করবার প্রস্তাব করল তখন রাশিয়া তাতে রাজী হয়ে গেল।

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ—এই ভাবে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করার পর ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। এর দুদিন পরে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সঙ্গে



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানবহর

সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় ছ'বছর ধরে চলেছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, এবার তার চেয়েও উন্নত এবং আরও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উভয় পক্ষ ব্যবহার করেছিল। এই যুদ্ধে সশস্ত্র বিমানবাহিনীগুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের ফলে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায় এবং জার্মানরা যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের শিবিরে একত্র করে তাদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একদিকে ছিল জার্মানী, ইটালী ও জাপান, এবং অন্য দিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া প্রায় দুবছর পরে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।



রুজভেল্ট

এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্ট, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ষ্ট্যালিন অপূর্ব নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে মিত্রপক্ষকে জয়যুক্ত করেন।

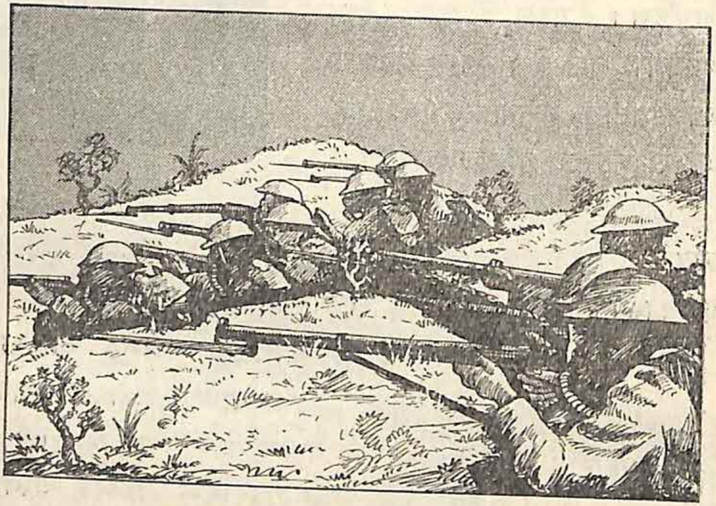
যুদ্ধের গতি : জার্মানী ও জাপানের অপূর্ব সাফল্য—যুদ্ধের প্রথমে জার্মানরা অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিল। দুই বছরের মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ড এবং রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ তাদের পদানত হয়। জার্মানীর এই রকম সাফল্য-লাভ দেখে জাপান জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইন সহ



চার্চিল

অনেকগুলি দ্বীপ, এবং মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জয় করে ভারতের পূর্ব-সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

রাশিয়া আক্রমণে জার্মানীর বিপর্যয়—জার্মানী ও জাপানের এই চমকপ্রদ অগ্রগতি কিন্তু স্থায়ী হ'ল না। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া জয় করতে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে রাশিয়ার মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাই জর্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করল এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়



ট্রেঞ্চের ভিতরে গ্যাস-নিরোধক মুখোশ পরিহিত সৈন্য

মহযুদ্ধের এক নূতন অধ্যায় শুরু হল। বিজয়ী জার্মান সৈন্য লেনিনগ্রাদ অবরোধ করে মস্কোর ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় তারা ভল্‌গা নদীর তীরে স্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধ করে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও জার্মান সৈন্য এই স্থান দুটি অধিকার করতে পারল না। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ানরা প্রবল বেগে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত রাশিয়া শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করে।

আফ্রিকার যুদ্ধে জার্মানী ও ইটালীর পরাজয়—১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতন যখন আসন্ন হয়ে আসে তখন মুসোলিনি জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। ইটালীর সৈন্যবাহিনী উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশদের অধিকৃত কতকগুলি উপনিবেশ জয় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংরাজরা তাদের বিতাড়িত করে। তখন জার্মান সৈন্য এসে আবার অনেকগুলি জায়গা পুনরধিকার করতে পেরেছিল। কিন্তু ইংরাজরা আবার পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুদের আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি তারা ইটালী আক্রমণ করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনির পতন হয়। তখন ইটালীর নূতন প্রধান মন্ত্রী মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঃ জার্মানীর আত্মসমর্পণ—এর পরের বছর ইংরাজ ও আমেরিকান বাহিনী ফরাসী দেশের উপকূলে অবতরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এদিকে পূর্ব ইউরোপেও রুশ বাহিনী ক্রমেই জার্মানীর দিকে এগিয়ে আসছিল। ১৯৪৫ সনের প্রথম দিকে এরা দুদিক থেকে খাস জার্মানী আক্রমণ করে। এর কিছুকল পরে হিটলারের মৃত্যুর কথা প্রকাশিত হয়। তখন জার্মানীও বিনা শর্তে বিজয়ীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ—এদিকে প্রথম সাফল্যের পর বিপক্ষ দলের হাতে জাপানেরও পরাজয় হচ্ছিল। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ চলছিল তাতে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করতে পারল না। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে আমেকিনরা উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে। তাদের বিমানবাহিনী গোলা বর্ষণ ক'রে জাপানী নৌ-বলের চূড়ান্ত ক্ষতি করে এবং নৌ-বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি পুনরধিকার করে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান

আসাম জয় করতে এসে বিফল হয় এবং পরের বছর ইংরাজ, আমেরিকান ও ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী ব্রহ্মদেশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এই সময়ে সুযোগ বুঝে রাশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে জাপান ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। শেষে যুদ্ধ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় এইজন্য আমেরিকানরা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামে দুটি শহরের উপর আণবিক বোমা (atom bomb) নামে দুটি নূতন বোমা বর্ষণ করে। এতে এই সমৃদ্ধ শহর দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মাত্র দুটি বোমার এই রকম ধ্বংসলীলা দেখে জাপান আর যুদ্ধ চালাতে সাহসী হ'ল না। জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রায় চারমাস পরে তারাও আত্মসমর্পণ করল।

নূতন সমস্যা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসান হলেও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়নি। যুদ্ধ শেষ হবার পরই বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন সমস্যা ও তাই নিয়ে বিবাদ দেখা দিল। এই সব সমস্যাগুলির কোন সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে এখন মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক দলে আছে সোভিয়েট রাশিয়া এবং আরও কয়েকটি সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অন্যদলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড এবং তাদের মিত্রগণ। এই দুই দল ছাড়া কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও আছে। আমাদের ভারতবর্ষ এই সব নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি। রাশিয়ার পরিচালিত দলটি বিশ্বাস করে যে, বলশেভিক আন্দোলনের মত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে শান্তি আসবে। কিন্তু বিপক্ষ দলের লোকেরা মনে করেন যে, এ নীতি মেনে চললে মানুষের সকল রকম স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে। এই দুটি দলের মতবিরোধ আজও দূর হয়ে যায় নি।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থা (United Nations Organisation বা U.N.O.)—এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করছে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার উপর। ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য অনেকটা জাতিসঙ্ঘেরই মত। তবে জাতিসঙ্ঘের চাইতে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষমতা অনেক বেশী। পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলি এবং আমাদের ভারতবর্ষ এই সংস্থার সদস্য। এঁরা বহু আন্তর্জাতিক কলহের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অবিচারের প্রতিবাদ করে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার সঙ্গে বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (W. H. O.) প্রভৃতি আরও কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান জড়িত থেকে আজ বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতির পরিকল্পনায় নিজেদের নিয়োগ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত লোকেদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য গড়ে উঠেছে সম্মিলিত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ—United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত সহযোগিতায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সৌহার্দ্যের ফলে বিশ্বশান্তি-রক্ষার প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৯১৪—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ
১৯১৭—রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে বিরতি
১৯১৮—জার্মানীর আত্মসমর্পণ
" ১১ই নভেম্বর—যুদ্ধবিরতি দিবস
১৯১৯—ভার্সাইর সন্ধি

১৯১৯—রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা
১৯২২—মুসোলিনির অভ্যুদয়
১৯৩৩—হিটলারের অভ্যুদয়
১৯৩৯—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ
১৯৪৩—ইটালীর পরাভব
১৯৪৫—জার্মানী ও জাপানের আত্মসমর্পণ
১৯৪৫—সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার প্রতিষ্ঠা

অনুশীলনী

১। কিভাবে জার্মানী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল? জার্মানীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল?

২। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ নির্দেশ কর। এই দুটি যুদ্ধের জন্য কি শুধু জার্মানীকেই দায়ী করা যায়?

৩। এই যুদ্ধ দুটিকে কেন বিশ্বযুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি কোথায় অবস্থিত ছিল? এই যুদ্ধ দুইটি কেন পূর্বেকার যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল?

৪। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্রের কি পরিবর্তন হয়েছিল? কেন এই পরিবর্তন করা হয়?

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ী দেশগুলি জার্মানীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

৬। মুসোলিনী ও হিটলারের অভ্যুদয় কেন সম্ভব হয়? তাঁদের পরিচালিত দলগুলি কি নামে পরিচিত হয়?

৭। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এখনও কেন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হয়নি?

৮। কি উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? কেন এই সঙ্ঘটির বিলোপ হয়েছে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কিভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

৯। আন্তর্জাতিক বিচারালয়, বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা ও সম্মিলিত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদের কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতা লাভ এবং চীনের বিপ্লব

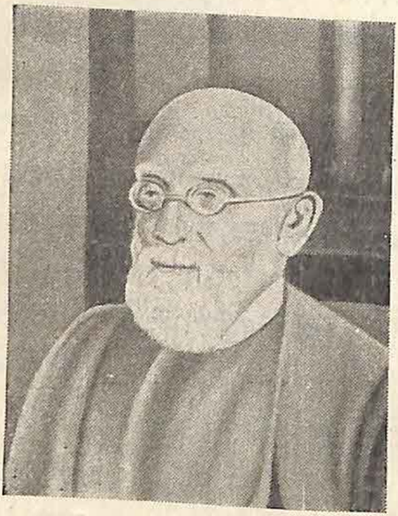
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আমরা দেখি যে, এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে ইউরোপীয় জাতিগুলি তাদের অধিকার স্থাপন করেছে, অবশিষ্ট দেশগুলির উপরও তারা প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সব পরাধীন দেশ ক্রমে নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল।

ইংরেজ-শাসনে ভারত—মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইংরাজ-শাসনে আবার ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলাও ছিল। বিদেশী শাসকেরা নানারকম সমাজ-সংস্কার, স্কুল-কলেজ স্থাপন, যানবাহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু দেশ-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন হাত ছিল না। বড় বড় রাজপদে শুধু ইংরাজরাই প্রতিষ্ঠিত থাকতেন; তাঁরা নিজেদের দেশের স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে ভারত-শাসন করতেন। এ দেশের লোকের অভাব-অভিযোগের প্রতি তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

আমাদের দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল এখানকার অগণিত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে। শহরের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ধনী দরিদ্র অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত, এবং

সেখানে নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু তৈরী করে নিত। কাজেই খাবার-পরবার বিশেষ কোন অভাব ছিল না—সাধারণ জীবনযাত্রাও সরল ছিল। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলন হওয়ায় এই প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, এবং বিদেশী বণিকদের প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই দিনে দিনে সাধারণ ভারতবাসীর দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্ট বেড়ে গেল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের নিয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করে এঁদের মনে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছিল, এবং দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তাঁরা শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার এঁদের আশা-ভরসা পূরণ করবার জন্য কিছুই করলেন না। এইজন্য তখনকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন করবার প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

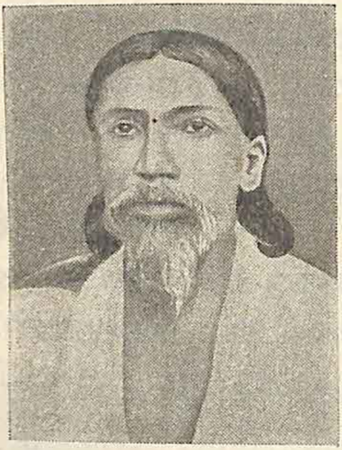
মোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মিলে "ভারত-সভা" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এর দুবছর পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউম নামে একজন সদাশয় ইংরাজ এবং পার্শী-নেতা দাদাভাই নৌরজীর উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন থেকে কংগ্রেসই হ'ল আমাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন।

ইংরাজদের সঙ্গে বিবাদ হয় সে রকম কোন ইচ্ছা নেতাদের ছিল না। তাঁরা প্রয়োজনমত সরকারী নীতির সমালোচনা করতেন, এবং ভারতীয়দের হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু এই রকম আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হ'ল না। তখন কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন দলের সৃষ্টি হ'ল। এদের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বঙ্গদেশের শ্রীঅরবিন্দ এবং পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়। ইংরাজদের কাছে কোন রকম আবেদন-নিবেদন না করে,



বালগঙ্গাধর তিলক

সমগ্র দেশবাসীদের সাহায্যে আন্দোলন চালিয়ে ইংরাজদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই ছিল এই নূতন দলের উদ্দেশ্য।



শ্রীঅরবিন্দ

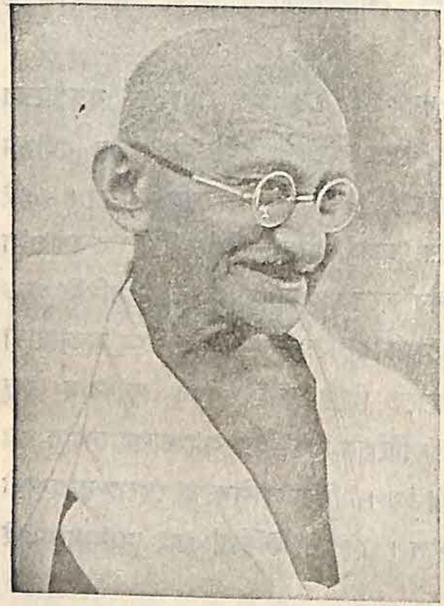
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ", রজনীকান্ত সেনের "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস" প্রভৃতি পড়ে শিক্ষিত বাঙালীর মনে বহুদিন থেকে অপূর্ব দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল। এইজন্য জাতীয় আন্দোলন বাংলা দেশেই অধিক প্রসার লাভ করেছিল। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম আগে বাংলাদেশের সঙ্গে একত্র ছিল। শাসন ব্যাপারে সুবিধা হবে বলে বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে এই বিশাল বাংলাদেশকে দুভাগ করেন। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ হ'ল, এর নাম হ'ল বঙ্গদেশ। পূর্ব ও উত্তর বাংলা এবং আসাম নিয়ে আর একটি প্রদেশ গঠন করা হ'ল। এই নূতন ব্যবস্থায় বাঙালী জাতির একতা নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। লর্ড কার্জনেরও তাই ছিল মনোগত ইচ্ছা। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙালী নেতারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এই সময়েই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী যুবক ও ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। স্বদেশী জিনিসের প্রতি দেশের লোকের অনুরাগ তখন বিশেষ বৃদ্ধি

পায়। বিলাতী জিনিসপত্র ও দোকানগুলি বর্জন ("বয়কট") করা হ'ল, বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে ফেলা হ'ল এবং নানা জায়গায় স্বদেশী দোকান ও কারখানা গড়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গান তখন সকলের মুখেই শোনা যেত। এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র আন্দোলনের জন্য "পিকেটিং", শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি চলতে থাকে।

এই বিরাট আন্দোলন দমন করবার জন্য বিদেশী সরকারের আদেশে পুলিশ আন্দোলনকারীদের মারপিঠ এবং নানা রকম নির্যাতন করে এবং শত শত লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য বাংলার যুবকেরা কতকগুলি বিপ্লবীদল গঠন করে। দেশের অনেক জায়গায় বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী নিহত হন। একজন অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীকে হত্যা করতে গিয়ে তরুণ যুবক ক্ষুদিরাম বসু সানন্দে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ছ'বছর আন্দোলন চলার পর বাংলাদেশকে আবার যুক্ত করা হয়। কিন্তু কলিকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামও এই সময়ে আলাদা হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ স্বরাজ আন্দোলন—বাংলাদেশ আবার যুক্ত হবার তিন বছর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। অ্যানি বেসাণ্ট নামে একজন সহৃদয়া ইংরাজ মহিলার নেতৃত্বে এই সময়ে কংগ্রেস স্বরাজ (Home Rule) আন্দোলন শুরু করেন। এদিকে বিপ্লবী দলগুলি এই সময়ে জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।

গান্ধীজী ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় শুরু হয়। এই সময়েই ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর উদয় হয়েছিল। গান্ধীজী বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছিলেন। দেশে ফিরে আসবার কিছু দিন পরে একটি মামলা উপলক্ষে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে যান। সেখানে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের হাতে ভারতীয়দের নানারকম লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হত। তাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অন্যায় আইনও বলবৎ ছিল। গান্ধীজী এই সব দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং এর প্রতিকার করবার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন।



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজী এর নাম দিয়েছিলেন 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। কোনো রকম অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, মনে কোন হিংসা বা বিদ্বেষ না রেখে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, যা সত্য, যা ন্যায়, তার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বহু ভারতবাসী, এমন কি কয়েকজন ইংরাজও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা গান্ধীজী ও তাঁর সহকারীদের

নানারকমে নির্যাতিত করে। কিন্তু শেষে তাদের নতি স্বীকার করতে হয়। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যে অন্যায় আইনগুলি ছিল তার কতকগুলি রদ করা হ'ল এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করবারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হ'ল। এই ভাবে গান্ধীজীর চেষ্টায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের জয় হয়েছিল।

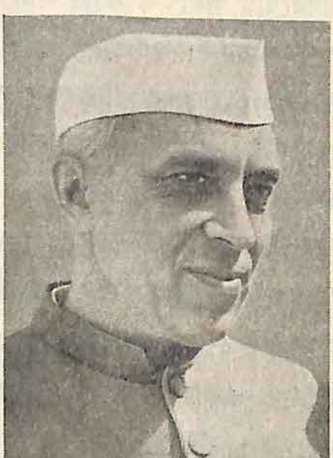
ভারতে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দুটি খুব বড় আন্দোলন হয়েছিল। একটি ১৯২১ সালে, আরেকটি এর নয় বছর পরে—১৯৩০ সালে। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের খলিফা অর্থাৎ প্রধান ধর্মগুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজ ও তার মিত্রেরা সুলতানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাতে বহু মুসলমানও গান্ধীজীর প্রথম আন্দোলনে যোগ দেয়। মনে কোন রকম হিংসার ভাব না রেখে বিদেশী সরকারের সঙ্গে সব রকমে অসহযোগ অর্থাৎ সরকারী অফিস-কাছারী, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বর্জন করে শাসন-ব্যবস্থা অচল করে দেওয়াই ছিল গান্ধীজীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি বড় বড় নেতারাও গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দিলেন। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলনে সাধারণ লোকদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর অপূর্ব আত্মত্যাগ, পবিত্র জীবন এবং দীনদুঃখীর প্রতি সহানুভূতি দেখে দলে দলে সাধারণ লোকেরাও এসে এবার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিল। অনেকে ওকালতী ব্যবসা, সরকারী চাকুরী এবং স্কুল-কলেজ ত্যাগ করলেন। বিলাতী জিনিসের দোকানে "পিকেটিং" করে দলে দলে লোক জেলে গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতিও পুরোদমে



সুভাষচন্দ্র বসু

চলতে থাকে। শেষে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক জায়গায় আন্দোলনকারীরা উল্টে মারপিঠ করাতে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী ঃ আইন অমান্য আন্দোলন—বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের লোকের অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু তখন পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করলেন। যে সব আন্দোলনের সাহায্যে ইংরাজ সরকার দেশ শাসন করতেন, গান্ধীজী তার অনেকগুলি অন্যায় বলে মনে করতেন। ১৯৩০ সালে নিজেই লবণ আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজী দ্বিতীয়বার আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজীর এই দ্বিতীয় আন্দোলন প্রথম আন্দোলনের চেয়েও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দমন-নীতির সাহায্যে সরকার পক্ষ এবারও জয়ী হ'ল। এদিকে বিপ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। অনেক বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তারের ভয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের সাহায্যে দেশের বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ



জওহরলাল নেহেরু

ঘোষণা করবার চেষ্টা করছিল। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরাজদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

সরকারের শাসন-সংস্কার—এদিকে প্রত্যেকবার আন্দোলনের পরেই দেশের লোকদের শান্ত করবার জন্য ইংরাজ সরকার কিছু কিছু শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থা করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা কিছু বাড়ান হয়েছিল। বড়লাটের শাসন-পরিষদেও একজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়। এই শাসন-সংস্কার **মর্লি-মিণ্টো সংস্কার** নামে পরিচিত। মর্লি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ভারতসচিব এবং মিণ্টো ছিলেন তখনকার বড়লাট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে প্রদেশ-গুলির ব্যবস্থা-পরিষদে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা আরও বাড়ান হয়। তা ছাড়া এই সময়ে প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু বিচার-বিভাগ, অর্থ-বিভাগ এবং শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগ গভর্নরের হাতেই থেকে যায়। এই নূতন শাসন-সংস্কার **মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার** নামে খ্যাত।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের পরে ১৯৩৫ সালে আরেক দফা শাসন-সংস্কার করা হয়। এবার ঠিক হ'ল যে, প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে ব্যবস্থা-পরিষদ থাকবে এবং এই পরিষদের সকল সদস্য জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন। প্রদেশের শাসনভার থাকবে একটি করে মন্ত্রিসভার হাতে। শাসনকার্যের জন্য তাঁরা ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। এছাড়াও ভারতের প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু

এই সংস্কারগুলির কোনটিই ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও "ভারত ছাড়' (১৯৪২) আন্দোলন— ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার চালু হবার পর যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী দলের জয় হয় এবং সেখানে তারাই মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর কংগ্রেস প্রস্তাব করল যে, দেশরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ইংরাজ সরকার এতে সম্মত হ'ল না। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। মহাত্মা গান্ধী তখন ইংরাজদের ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন; তা না হলে তিনি আবার আন্দোলন শুরু করবেন একথাও তাদের জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হবার আগেই সরকার পক্ষ তাঁকে এবং অন্যান্য নেতাদের বন্দী করল। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল; ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এরকম বিদ্রোহ আর হয়নি। কিন্তু উৎপীড়ন, অত্যাচার এবং গোলাগুলির সাহায্যে অতি কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের একজন বড় নেতা। গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি সব বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাঁর পথ ছিল বিপ্লবীর পথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তাঁকে বন্দী করা হয়। তিনি গোপনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। শেষে ব্রহ্মদেশে গিয়ে জাপানীদের হাতে যে সব ভারতীয়রা বন্দী হয়েছিল তাদের নিয়ে তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করেন এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। জাপান যখন হেরে গেল তখন আজাদ-হিন্দ-ফৌজও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

স্বাধীনতা লাভ—যুদ্ধ শেষ হলে শাহ্‌জাহনের নির্মিত দিল্লী দুর্গে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কয়েকজন নেতার বিচার শুরু হয়। এর প্রতিবাদে দেশময় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হ'ল। তখন ভারতবাসীদের সঙ্গে মিটমাট করবার জন্য বিলাত থেকে তিনজন মন্ত্রী এদেশে আসেন। তাঁরা সকল কিছু দেখে শুনে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া স্থির করলেন। কিন্তু মুস্লিম লীগের নেতা কায়েদ-ই-আজম জিন্না বললেন যে মুসলমানেরা পাকিস্তান না পেলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়াতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বেধে গেল। শেষে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য বড়লাট মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করে স্বাধীনতা দেবার জন্য সুপারিশ করেন। ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা এবং ভারতীয় নেতারা তাতেই রাজী হলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল আন্দোলন ও অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগের পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন দেশবরেণ্য নেতা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। তিনি অবসর গ্রহণ করার পর সভাপতি হয়েছেন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্। স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন সর্বজনপ্রিয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ১৯৬৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের অগ্রগতিঃ (১) ভারত যুক্ত-রাষ্ট্রের সংহতিবিধান—স্বাধীনতালাভের পর নেতাদের প্রধান কাজ হ'ল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা এবং সর্বতোভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান করা। ইংরাজেরা এদেশ পরিত্যাগ

করে চলে যাবার পরও বিদেশী শাসন সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'ল না। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ফরাসী ও পর্তুগীজদের শাসনাধীন ছিল। এইসব অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কিছুকাল শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর ফরাসীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়। পর্তুগীজরা কিন্তু কোন শর্তেই তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলির স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হ'ল না। অবশেষে বলপ্রয়োগে দক্ষিণ ভারতে গোয়া অধিকার করে তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এইভাবে ভারতে বিদেশী শাসনের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। এছাড়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সংহতিবিধানের জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর ফলে দেশের জনমতের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। আমাদের দেশে এপর্যন্ত তিনবার সাধারণ নির্বাচন হয়েছে এবং তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতবাসী সম্পূর্ণ আস্থাবান।

(২) **আর্থিক উন্নতি**—ইংরাজ রাজত্বে বিদেশী বণিকদের প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল একথা আমরা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলেছি। ভারতবাসীর দারিদ্র্য ক্রমে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত পুনরায় যাতে পাশ্চাত্য জগতের প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সমতা আসে সেজন্য দেশের বর্তমান শাসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য এযাবৎ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে; দামোদর,

চম্বল, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে; এবং লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ভারী ভারী শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি, রেল, এরোপ্লেন, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহন প্রস্তুত করবার জন্য দেশে নানাস্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। বড় বড় রাজপথ ও রাস্তাঘাট নির্মাণেরও ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের জাতীয় ঐশ্বর্য এখন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে এদেশের অধিবাসীরা প্রভূত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হবে।

(৩) **সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন**—স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সমাজ-ব্যবস্থাতেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা এখন বেআইনী; মঠ-মন্দিরে এখন সকল জাতির লোক প্রবেশ-অধিকার পেয়েছে। স্ত্রীজাতি সর্ববিষয়ে পুরুষের সমানাধিকার পেয়েছে এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৪) **শিক্ষা**—শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। তাই প্রত্যেক শিশু যাতে শিক্ষা লাভ করে সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা এখন আবশ্যিক করা হয়েছে। দেশের নানাস্থানে বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। দেশের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আজ বিশ্বের দরবারে আমরা গৌরব বোধ করি।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান—ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এক মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ ও দ্বন্দ্বের মীমাংসার

জন্য কোন রকম বলপ্রয়োগ বা অপপ্রচার ভারত পছন্দ করে না। সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করা ও শান্তিপূর্ণভাবে সকল প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ ও দ্বন্দ্বের মীমাংসা করাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কারণে ভারত সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং সংস্থার সর্বপ্রকার কার্যাবলীর সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯৫৩ সালে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই সংস্থার সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতের চেষ্টায়ই এই সংস্থা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। আফ্রিকার ইতালীয় উপনিবেশগুলি ভারতের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মিশরের বিরুদ্ধে ইংরাজ, ফরাসী ও ইস্রায়েল যে যুক্ত আক্রমণ করেছিল তার মীমাংসাও ভারতের চেষ্টায়ই ফলবতী হয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভেও ভারত যথেষ্ট সাহায্য করে। ইন্দোচীনের গৃহবিবাদ মেটাবার জন্য রাষ্ট্রসংস্থা যে কমিটি নিযুক্ত করেছে তার সভাপতি হলেন একজন ভারতীয়। কোরিয়ায় চীন-মার্কিন সংঘর্ষের মীমাংসাতেও ভারত বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। স্বাধীনতালাভের পর কঙ্গোতে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয় এবং দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেখানে শান্তি রক্ষার ভার ভারতের উপর ন্যস্ত হয়। ভারত সে কাজ সুষ্ঠভাবেই পালন করেছে।

বিশ্বের শান্তি কিন্তু আজও নানা কারণে বিঘ্নিত। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ-বিসংবাদ ও দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। রাষ্ট্র পরিচালনায়ও নানারকম আদর্শগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। ফলে কতকগুলি রাষ্ট্র-জোটের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব জোটের নেতৃত্ব করছে একদিকে

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং অপর দিকে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের মতে এই রাষ্ট্র-জোটগুলির দ্বন্দ্বের পরিণাম হবে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যাতে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই ভারত কোন রকম রাষ্ট্র-জোটের সঙ্গে যোগ দেবার বিরোধী। ভারত চায় সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক—সকলের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে। ভারতের এই গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতি (non-alignment) এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকগুলি নূতন রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এর ফলে বিশ্বের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভারতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক নূতন শক্তির সৃষ্টি হয়েছে—যে শক্তি যুদ্ধ বিগ্রহকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা মনীষী ভারতের এই গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করেছেন।

ইরান ও তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম—পশ্চিম এশিয়ার একটি বড় দেশ ইরান বা পারস্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই দেশটি একরকম স্বাধীন ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানের দক্ষিণ অঞ্চলে খুব ভাল তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়। তখন এগুলির প্রতি বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। ১৯০৭ সালে ইংরাজ ও রাশিয়ানরা ভাগাভাগি করে যথাক্রমে ইরানের দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজরাই একরকম ইরানের প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রেজা খাঁ নামে এক জন পারসিক সেনাপতি সসৈন্যে রাজধানী তেহ্‌রানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে দেশকে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু তেলের খনিগুলির অধিকার নিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে ইরানীদের বিবাদের পুরোপুরি মীমাংসা এখনও হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কেরও অত্যন্ত দুর্দশা হয়েছিল। যুদ্ধে হেরে যাওয়াতে খাস তুরস্কের কতকগুলি জায়গা ইংরাজ, ইটালীয় ও গ্রীকেরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। কিন্তু তুর্কীরা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হ'ল না। তখন মুস্তাফা **কামাল আতাতুর্ক** তুর্কীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। দেশপ্রেমিক তুর্কীদের নিয়ে তিনি একটি জাতীয় পরিষদ গড়ে তোলেন এবং আঙ্কারা শহরে রাজধানী স্থাপন করে তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে যুদ্ধ করে তিনি বিদেশীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে সুলতানকে পদচ্যুত করে তুরস্কে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। এর কিছু কাল পরে খলিফা পদও তুলে দেওয়া হয়। কামাল স্বাধীন তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কামালের একচ্ছত্র শাসনে তুরস্ক আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কাজীর বিচার তুলে দিয়ে সেখানে তিনি আধুনিক বিচার-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, স্কুল কলেজ স্থাপন করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ব্যবস্থা করেন। মেয়েদের পর্দাপ্রথাও তুলে দেওয়া হয়েছে। আরবী হরফের বদলে ল্যাটিন হরফে লিখবার ব্যবস্থাও তিনি প্রচলন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছু পূর্বে কামালের মৃত্যু হয়।

এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন—পাশ্চাত্য দেশের ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তিলাভের অগ্রদূত আমাদের এই ভারতবর্ষ। আমাদের দেশের নেতারা শুধু একমাত্র আমাদের দেশেরই স্বাধীনতা চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র ঔপনিবেশক শাসনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। তাই

যেখানে যখনই স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলন হয়েছে ভারতবাসী সর্বদাই তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। ঔপনিবেশিক স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশ সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার সভ্য হয়। এই সংস্থার মাধ্যমেও ভারত অন্যান্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতালাভে উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হয়। অবশেষে এই সব অঞ্চলের বেশীর ভাগই সার্বভৌম স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হয়েছে।

আরব জাতির স্বাধীনতা লাভ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আরব ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের পরে এখানে কতকগুলি ছোট ছোট আরব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলির নাম—প্যালেষ্টাইন, ট্রান্স-জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন, সৌদী আরব এবং হেজাজ। তুরস্কের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ এদের স্বাধীন বলে স্বীকার করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে সৌদী আরব ও হেজাজ ছাড়া অন্য কারও স্বাধীনতা তারা স্বীকার করল না। ইরাক, ট্রান্স-জর্ডান ও প্যালেষ্টাইনের প্রকৃত শাসনকর্তা হ'ল ইংল্যাণ্ড, এবং সিরিয়ার ফ্রান্স। এখন এরা প্রায় সকলেই স্বাধীন হয়েছে। এইসব আরব দেশগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য মিশরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি **আরব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের** প্রতিষ্ঠা করেছে।

মিশর—আরব দেশগুলির মধ্যে মিশরই হ'ল সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী। মিশরে কি ভাবে ইংরাজ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল সে কথা আমরা আগেই বলেছি। মিশরীদের মধ্যে ক্রমে জাতীয়তা-বোধ

জেগে ওঠে এবং তারা স্বাধীনতালাভের জন্য আন্দোলন শুরু করে। মিশরের জাতীয় দলের নাম ওয়াফ্‌ত্‌। ১৯২২ সালে ইংরাজরা মিশরকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বৈদেশিক নীতির পরিচালনা এবং দেশরক্ষার ভার তারা ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল না। সম্প্রতি ইরান ও তুরস্কের মত মিশরেও একজন শক্তিশালী সেনা-নায়কের উদয় হয়েছে। এঁর নাম গোমেল আবদুল নাসের। তাঁর নেতৃত্বে সুলতান ফারুখ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে মিশরে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বদেশ থেকে ইংরাজদেরও তিনি বিতাড়িত করেছেন। মিশর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

অন্যান্য দেশ—মিশর ছাড়া ইংরাজ, ফরাসী, ইটালীয়ান ও বেলজিয়ানদের কবল থেকে যে সব অঞ্চল স্বাধীন হয়েছে সেগুলি নিয়ে আফ্রিকার কয়েকটি নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঘানা, নাইজিরিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উগাণ্ডা, কঙ্গো, মরোক্কো, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র, মালি, টেগো, আইভরি কোস্ট, ম্যাডাগাস্কার, সোমালি সাধারণতন্ত্র, সুদান। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কেনিয়াও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আফ্রিকার এই নবজাগরণ বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতালাভের জন্য এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অনেক দিন ধরে বিদেশীদের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইন্দোচীন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলি জাপান জয় করে। জাপানের পরাজয়ের পর, অনেক আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এই সব দেশের অধিবাসীদের হাতে পড়ে। সেইজন্য তারা আর পরাধীন

থাকতে চাইল না। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে এইজন্য ওলন্দাজদের মাঝে মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ হত এবং সেই সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার কথা চলত। অবশেষে ইংরাজদের মধ্যস্থতায় ইন্দো-নেশিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন এখানে একটি সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এর সভাপতি হলেন ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রেমিক নেতা সোকর্ণ।

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও মালয়—১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি রাজ্যও তাদের পূর্বেকার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। ব্রহ্মদেশে একটি সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু সিংহলে এখনও ইংল্যাণ্ড থেকে একজন গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর বিশেষ কোন ক্ষমতাই নেই।

ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ। ইংরাজরা এখানেও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। ১৯৫৭ সালে এগারোটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে মালয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় এবং মালয়কে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সম্প্রতি ইংরাজ অধিকৃত সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, উত্তর বোর্ণিও ও সারাওয়াক অঞ্চল মালয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ করে মালয়েশিয়া নামে একটি বৃহত্তর স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

ইন্দোচীন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসীদের অধিকৃত ইন্দোচীনেও সাম্যবাদীরা প্রবল হয়ে উঠেছে। ডাঃ হো-শি-মিনের নেতৃত্বে ইন্দোচীনের জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎমিন দল উত্তর ইন্দোচীনে স্বাধীনতা লাভ করেছে। দক্ষিণ ইন্দোচীনেও ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। এখানে ভিয়েৎনাম দলের নেতারা দেশ শাসন করেন। এঁরা সাম্যবাদের অত্যন্ত বিরোধী।

চীনের বিপ্লব—চীনের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর কুয়ো-মিং-টাং দলের সঙ্গে সাম্যবাদী দলের আবার প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। চীনের সাম্যবাদীদের নেতার নাম মাও-সে-তুং। তিনি ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের সহযোগী ছিলেন। চিয়াং-কাই-শেক সাম্য-বাদীদের দমন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে সমগ্র চীন অধিকার করে। চিয়াং-কাই-শেক তার দল বল নিয়ে ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তিনি আবার চীন জয় করবার চেষ্টা করছেন। সাম্যবাদী দলের জয়লাভের পর ১৯৪৯ সালে চীনের সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মাও-সে-তুং এর প্রথম সভাপতি হন। চীনের সাম্যবাদী নেতারা নূতন ভাবে তাদের দেশ গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা সর্বত্র সুফল লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

ভারতের উপর চীনা আক্রমণ—নতুন চীনের বর্তমান নেতারা জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী। তারা বলপ্রয়োগে বিপ্লব অথবা সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টি করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে নিজস্ব সাম্যবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করছে। উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ইন্দোচীনে চীনের প্ররোচনায় সাম্যবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে চীন সবলে তিব্বত অধিকার করে। চীনের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করবার জন্য ভারত এই ব্যবস্থা মেনে নেয়। কিন্তু জঙ্গীবাদী চীন এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। তারা চিরাচরিত সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছে। গত কয়েক বৎসর ধরেই চীনা-সৈন্য হিমালয়ের বিশাল পর্বতরাজি উল্লঙ্ঘন করে ভারতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল। এর পর থেকে চীন-ভারতের সীমান্তের প্রশ্নটি গুরুতর

আকার ধারণ করেছে। কাশ্মীরের লাডাক অঞ্চল ও ম্যাকমোহন লাইনের দক্ষিণে আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের এক বিশাল অংশ এবং হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত আরও কয়েকটি স্থানের উপর চীনারা অধিকার দাবী করেছে। কিন্তু ভারত এই দাবী অস্বীকার করে। চীনারা শান্তিপূর্ণভাবে এই সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসা না করে ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে লাডাক ও উত্তর-পূর্বসীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে ভারত সীমান্তের এক বিশাল অংশ অধিকার করে নেয়। এই নগ্ন আক্রমণের বীভৎসতায় সমগ্র দেশে চীনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ দেখা দিল। দেশরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণ উদ্যোগ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। তারা কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হ'ল না। ভারতীয় সৈন্য অসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। আক্রমণের একমাস পরে চীনারা পশ্চাদপসরণ করে নিজেরাই এক যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা স্থির করেছে। চীন ও ভারতের মধ্যে সংঘর্ষ সম্প্রতি থেমে গেছে, কিন্তু চীনাদের নির্ধারিত সীমারেখা মেনে নিতে ভারত রাজী হতে পারে নি। তার কারণ ভারতের নিকট এ আত্মসমর্পণের নামান্তর মাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকার ছ'টি নির্দলীয় রাষ্ট্র চীন-ভারতের এই সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করছে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ ও তাশখন্দের চুক্তি—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বাধীনতালাভের পর কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগদান করে, এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান এই ব্যবস্থা স্বীকার না করে সেই সময় থেকে প্রায়ই কাশ্মীরে সশস্ত্র আক্রমণ

চালায়। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাস থেকে পাকিস্তান আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভারত আক্রমণ করে। তিন সপ্তাহব্যাপী সেই সংঘর্ষে ভারতের বীর জওয়ানরা অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করে। জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হলেও শান্তি স্থাপিত হল না। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী কোসিগিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁকে রাশিয়ার তাশখন্দে এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান জানান। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোসিগিনের প্রচেষ্টায় উভয় দেশের নেতৃদ্বয় সকল প্রকার বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি যুক্ত ইস্তাহারে সই করেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির উপর ভিত্তি করে এই ইস্তাহার রচিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কিছু পরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাশখন্দের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ্বশান্তির অন্যতম অগ্রদূতরূপে তিনি যে স্বাক্ষর রেখে গেলেন, সমগ্র ভারত-পাকিস্তানের অধিবাসীরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার কথা মনে রাখবে। আশা করা যায়, তাশখন্দের চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে চির-বন্ধুত্বের সেতু হয়ে বিরাজ করবে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের তৃতীয় প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ঘটনা

১৮৮৫—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯০৯—মর্লি-মিন্টো সংস্কার

১৯১৯—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার

১৯২১—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন

১৯৩০—আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩৫—ভারত-সংস্কার আইন

১৯৪২—"ভারত ছাড়" আন্দোলন

১৯৪৭—১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা লাভ

১৯৫০—ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

১৯৬২—চীনের ভারত আক্রমণ

অনুশীলনী

১। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান? এই আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর কি দান?

২। কেন ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে? এদেশে এখন কিরূপ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কেন হয়েছিল? কারা নেতৃত্ব করেছিলেন?

৪। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়?

৫। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কি জান? বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কোথায়?

৬। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান?

শতাব্দী	ইউরোপ ও আমেরিকা
চতুর্দশ	পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪)—ইটালীতে রেনেসাঁসের সূচনা
পঞ্চদশ	রেনেসাঁসের যুগ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩) কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২) ভাস্কো দা গামার ভারতের উদ্দেশে যাত্রা (১৪৯৭)
ষোড়শ	ধর্ম সংস্কারের যুগ পোপের "মুক্তিপত্র" বিক্রয়ের বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদ (১৫১৭) ম্যাজেলান ও তাঁর সঙ্গীদের ভূ-প্রদক্ষিণ (১৫১৯-২২) মেক্সিকো বিজয় (১৫১৯-২১), পেরু বিজয় (১৫৩২-৩৬) এলিজাবেথের রাজত্ব-কাল (১৫৫৮-১৬০৩) শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)
সপ্তদশ	ষ্টুয়ার্টবংশের রাজত্বকাল (১৬০৩-১৭১৪) রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ—নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-৪৯)—গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮)—পার্লামেন্টের অধিকার সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা (১৬৮৯) আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা
অষ্টাদশ	ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬) ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) সন্ত্রাস রাজত্ব (১৭৯৩-৯৪) নেপোলিয়নের অভ্যুদয় (১৭৯৯)
ঊনবিংশ	নেপোলিয়নের পতন ; ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৫) ১৮৪৮ সনের বিপ্লব ইটালীর ঐক্যলাভ (১৮৬১)

ভারতবর্ষ	এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও আফ্রিকা
ভাস্কো দা গামার ভারত আগমন (১৪৯৮)	
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ—মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা (১৫২৬) আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা (১৬০০)	পর্তুগালের মালাক্কা দ্বীপ অধিকার (১৫১১) স্পেনের ফিলিপাইন দ্বীপ বিজয় (১৫৬৫)
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল (১৬০৫-২৭) শাহ্ জাহানের ,, (১৬২৮-৫৮) ঔরংজেবের ,, (১৬৫৮-১৭০৭)	ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত (আনুমানিক ১৬০২) রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় অধিকার বিস্তার
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯) ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (১৭৪৪-৬১) পলাশীর যুদ্ধ—বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত (১৭৫৭) মহীশূর রাজ্যের পতন (১৭৯৯)	মালয়ে ইংরাজ আধিপত্যের সূচনা (১৭৮৬) সিংহলে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা (১৭৯৫)
মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন (১৮১৯) সিন্ধুবিজয় (১৮৪৩) পঞ্জাব অধিকার (১৮৪৯)	ইংল্যাণ্ড কর্তৃক আফ্রিকার কেপ কলোনী অধিকার (১৮১৪) ব্রহ্মদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত (১৮২৬)

শতাব্দী	ইউরোপ ও আমেরিকা
উনবিংশ	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) জার্মানীর ঐক্যলাভ (১৮৬৬-৭১) অস্ট্রিয়ার সহিত জার্মানীর মিত্রতা (১৮৮২)
বিংশ	জার্মানীর শক্তিসঞ্চয়—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত বিরোধ **প্র থ ম বি শ্ব যু দ্ধ (১৯১৪-১৮)** ভার্সাইএর সন্ধি (১৯১৯) রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা (১৯১৯) ইটালীতে মুসোলিনীর অভ্যুত্থান (১৯২২) রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের কর্তৃত্বলাভ (১৯২৪) জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান (১৯৩৩) **দ্বি তী য় বি শ্ব যু দ্ধ (১৯৩৯-৪৫)** সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার প্রতিষ্ঠা (১৯৪৫)

ভারতবর্ষ	এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও আফ্রিকা
১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ—ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণ (১৮৫৮) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)	প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) পেরীর জাপানে আগমন (১৮৫৩-৫৪) মিকাডোর ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা—জাপানে নবযুগের সূচনা (১৮৬৭) আফ্রিকা বণ্টন (১৮৮১-৯০) মিশরে ইংরাজ আধিপত্য (১৮৮২) চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪) ইউরোপীয়দের চীনে প্রভাব বিস্তার আমেরিকার ফিলিপাইন হাওয়াই প্রভৃতি অধিকার (১৮৯৮-৯৯) বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০)
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯) বঙ্গভঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী অপসারণ (১৯১১)	রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫) ইরানে ইংরাজ ও রুশ জাতির প্রভাব বিস্তার (১৯০৭) চীনের বিপ্লব (১৯১১)
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)	
মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার (১৯১৯) গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০) নূতন ভারত শাসন সংস্কার আইন (১৯৩৫) কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ (১৯৩৭)	ইরানে রেজা শাহ পহলবীর অভ্যুত্থান (১৯২১) তুরস্কে কামাল পাশার অভ্যুত্থান (১৯২২) মিশরের আংশিক স্বাধীনতা লাভ (১৯২২) জাপানের চীন আক্রমণ (১৯৩১)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)	
"ভারত ছাড়" আন্দোলন (১৯৪২) স্বাধীনতা লাভ (১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭) সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০) চীনের ভারত আক্রমণ (১৯৬২) ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ ও তাশখন্দ চুক্তি (১৯৬৫-৬৬)	ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র ঘোষণা (১৯৪৫), পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৯) ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৮) চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ (১৯৫৩-৫৪) আফ্রিকার নবজাগরণ (১৯৫৭)

PRICE
Rs. 2 25 nP.

Raichaudhuri and Chakravarti's History, Part III, for Class VIII, Bengali
Price Rs. 2·05